ইচ্ছামতী

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃবর্ষা সংখ্যা ২০০৯........1
বর্ষার কথা: টিপ টিপ বৃষ্টি........3
ছড়া-কবিতা........12
পাঁচমারির ভোজ........12
গল্প-স্বল্প........14
বাড়ির মধ্যে বাঘ........14
ইচ্ছে মতন: আশ্চর্য দেশলাইকাঠি........18
আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৪........21
পড়ে পাওয়া: ভুলোর ভুল........24
গত সংখ্যায় পেয়েছি: সত্যজিত রায়........25
মনের মানুষ: হাসি-খুশি........30
দেশে-বিদেশে: বেড়িয়ে এলাম ফুলিয়াপাড়া........32
ছবির খবর: দ্য ব্লু আমব্রেলা........40
বায়োস্কোপের বারোকথা: ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ........44
পরশমণি: রান্না ঘরে গোলমাল........48
জানা-অজানা........50
বৈঠকী রবি ঠাকুর........50
নাকাই আর পিপিলীকাভূক 52
কমিক্‌স্‌ কাহিনী: দুই বেড়ালের গপ্পো........56
এক্কা-দোক্কা: তীর ধনুক........59
আঁকিবুকি........64

প্রথম পাতাঃবর্ষা সংখ্যা ২০০৯

গরমের ছুটির পর স্কুল তো খুলে গেছে অনেকদিন, পরীক্ষাও হচ্ছে নিশ্চয় মাঝে মাঝে। স্কুলের গরমের ছুটি শেষ হয়ে গেলে কি হয়, গরমকালের যেনো আর ছুটিই হচ্ছিলো না। ক্যালেন্ডারের পাতায় আষাঢ় মাস তো কবেই এসে গেছে। অথচ আমার বাড়ির আশ-পাশ থেকে তো গ্রীষ্মকালটা যেতেই চাইছিল না! কি গরম, কি গরম - একেবারে ঘেমে-নেয়ে একশা! আমার বাড়ির পাশের কদম ফুলের গাছটা তো আর অত-শত ভাবেনি। সে যেই টের পেয়েছে আষাঢ় এসেছে, অমনি ওই গরমের মধ্যেই ডাল-পালা ভরিয়ে ফেলেছে গোল গোল হলুদ-সাদা ফুলে। ছাতের টবে একলা বেলফুলের গাছটাও দুইখানা মনমাতানো গন্ধে ভরা ফুল ফুটিয়ে ফেললো।

এদিকে আমি তো "আয় বৃষ্টি ঝেঁ-এ-পে-এ-এ, ধান দেবো মে-এ-পে-এ-এ" গানটা রোজ গাইছি। গাইতে গাইতে এইতো মাত্র কিছুদিন আগে শেষমেষ বর্ষারানী এলেন -ঝিরঝির,ঝুরঝুর,ঝমঝম - কত রকমের বাজনা বাজিয়ে, আকাশ ছাই ছাই রঙের মেঘে ঢেকে, শুকনো পৃথিবীকে ধারাস্নান করালেন। আর অমনি চারিদিকটা কেমন বদলে গেলো। মাটির থেকে উঠে এলো একটা মন-কেমন করা সোঁদা গন্ধ। যে গাছপালাগুলি এতোদিন ধুলোয় ঢাকা পড়ে ছিলো, সেগুলি ধুয়ে মুছে চকচকে হয়ে গেলো। আর তোমার স্কুলে যাওয়ার সঙ্গী হলো রঙচঙে রেইনকোট, বড়দের মাথায় উঠলো ছাতা। ইচ্ছামতীর গত সংখ্যার গল্প "ইস্কুলে ভূত" এর সমুর মতো তুমিও নিশ্চয় রাস্তায় জমা জলে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে বাড়ি ফেরো? আমার কাছে লুকিও না - আরে, মা যতই বকুন, আমি তো জানি, মা নিজেও ছোটবেলায় একই কাজ করতেন। আর তোমাকে চুপিচুপি বলি, আমার ছোটবেলায় আমিও করতাম মাঝে মাঝে...আচ্ছা বলো, বর্ষাকালে যদি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতটাকে নাই ভেজালাম, তাহলে আর বৃষ্টি পড়ে লাভ কি হলো? আর রাস্তার ধারে বয়ে যাওয়া জলে যদি একটা কাগজের নৌকা না ভাসাও তাহলেই বা চলে কি করে? বড়রা এইসব কিছু বোঝেননা, খালি ঠাণ্ডা লেগে যাবে বলে বকাবকি করেন। তবে একটা কথা, যদি খুব জোরে জোরে বৃষ্টি হয়, তাহলে বেশি না ভেজাই ভালো। তবে যদি ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হয়, তাহলে নাহয় একটু জল ঘাঁটাই যেতে পারে। আর তারপরে ইলিশমাছ ভাজার সাথে গরমাগরম খিচুড়ি হলে তো কথাই নেই - ঠাণ্ডা- সর্দি আর ধারকাছ ঘেঁষবে না।

তুমি নিশ্চয় এতক্ষনে ভাবছো- চাঁদের বুড়ি বেশ লোক! একে তো এত্তো দেরি করে বর্ষা সংখ্যা নিয়ে এলো, আর এসে থেকে খালি নানান গল্প করছে। আসলে কি জানোতো, আমার বাড়ির আশেপাশে তো বর্ষা অনেক দেরীতে এলো, আর ইচ্ছামতীও বললো বৃষ্টির হাত না ধরে যাবোনা...তাই আমরাও এলাম সময়ের কিছু পরে। গত কয়েকদিনের কয়েকটা ঘটনায় আমাদের মনও একটু খারাপ ছিল। সেই যে গত মে মাসে শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে একদিন আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে এলো সাইক্লোন, যার নাম 'আয়লা' -ভেঙ্গে দিলো কত অসহায় মানুষের ঘর-বাড়ি, ভাসিয়ে নিয়ে গেলো সবকিছু। সেই ঝড়ে ভেঙ্গে গেলো সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর বাঁধ, আর চাষের জমিতে ঢুকে পড়ল নোনা জল। এর ফলে কি হল বলতো - ওই জমিগুলিতে আগামি কয়েকবছর আর চাষ করা যাবে না। ফলে আর ফসল ও ফলবে না, ফলে চাষীভাইদের উপার্জনও থাকবে না। নতুন নতুন উপার্জনের খোঁজে হয়ত বা ঘর ছাড়তে হবে তাঁদের। তারপর এইতো মাত্র কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন সঙ্গীতজগতের দুইজন বিশ্ববিখ্যাত তারকা। প্রথমে গেলেন বর্ষীয়ান ভারতীয় সরোদ শিল্পী উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব। আর তারপরে চলে গেলেন পৃথিবীর সবথেকে জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী - মাইকেল জ্যাকসন। তুমি কি আলি আকবর খাঁ সাহেবের সরোদ বাজানো শুনেছ? বা মাইকেল জ্যাকসনের সেই বিখ্যাত গান -'হিল দ্য ওয়ারল্ড'? - যে গানে তিনি বলেছিলেন সারাটা পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলতে হবে সবার ভালো থাকার জন্য - এখনকার প্রজন্ম, আগামি প্রজন্ম, সবার জন্য...।জানোতো- সঙ্গীত হল এমন এক শিল্প, যেটা কিন্তু ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে মানুষকে কাছাকাছি করে দেয়। উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব এবং মাইকেল জ্যাকসন - দুইজনে সঙ্গীতের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার সাধনা করতেন, কিন্তু দুজনেই ছুঁয়েছিলেন সারা পৃথিবীর মন। তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্যে রইল আমাদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

এবার আমার কলম থামাই। তুমি বরং ইচ্ছামতীর পাতাগুলিকে উল্টে-পাল্টে দেখো এবার। সব নিয়মিত বিভাগ গুলিই আছে এবারো। পড়তে ভুলোনা রাসকিন বন্ডের অনুবাদ গল্প। আর "ইচ্ছে মতন" বিভাগে অবশ্যই পড়ো ইচ্ছামতীর বন্ধু ঋদ্ধির লেখা গল্পখানা।

শেষ করার আগে ইচ্ছামতীর নতুন বন্ধুদের জন্য কিছু পুরানো দরকারি কথা আরেকবার বলে নিই। এই ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে Unicode font ব্যবহার করে। তোমার কম্প্যুটার এ Unicode font না থাকলে, বা ব্রাওজার বাংলা বর্ন ঠিক ভাবে দেখাতে না পারলে, এই পাতার ওপরের বাঁ দিকের দ্বিতীয় লিঙ্কটা ভালো করে পড়ে নাও। এই ওয়েবসাইট সবথেকে ভাল দেখা যাবে Firefox Browser এ। Internet Explorer 6 & 7 browser দুটি একটি অক্ষর ঠিক করে দেখাতে পারছে না। তাই আমরা "উত্সব", "হঠাত্" এই সব শব্দে 'খন্ড ত' এর বদলে 'ত ' ব্যবহার করেছি। না হলে দেখতে খারাপ লাগছে। যাঁরা সব খুব গম্ভীর চশমাআঁটা পাঠক, ভুল বানান দেখলেই রেগে যান, তাঁরা নিশ্চয় আমাদের ওপর এই কারণে রেগে যাবেন না।

ভালো থেকো। তোমার জন্য রইলো আমার আঁচলভরা স্বর্নচাঁপা, কাঁঠালীচাঁপা, কামিনী, যুঁই, গন্ধরাজ আর হাস্নুহানার সুগন্ধ।

চাঁদের বুড়ি

[বর্ষার কথা: টিপ টিপ বৃষ্টি]

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, আর মেঘের দল ছুটে আসছে আমার দিকে। আমি দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি...সামনে ছোট্ট একটা পাহাড়ের গ্রাম। চোখ বন্ধ করলেই স্বপ্নটা আমাকে যখন তখন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। আর আমি আলসেমি করে চোখ বন্ধ করে থাকতাম।

সামনে ছোট্ট একটা পাহাড়ের গ্রাম...

মা বলতেন, "টুকনু পড়ার সময় তুমি পড়ো...আর খেলার সময় খেলো।" রাগে গজগজ করতে করতে সহজপাঠ খুলে বসতাম। তুমি কি সহজ পাঠ পড়েছো? কার লেখা বলোতো? হুম ঠিকই ভেবেছো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"বাদল করেছে। মেঘের রঙ ঘন নীল। ঢং ঢং করে ন-টা বাজলো। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে সংসার-বাবুর বাসায়।"

আমার চমক ভাঙলো। কারণ স্কুলের মিড-ডে মিলের ঘন্টা পড়লো। জয়ন্তী রাভা, বিকাশ রাভা তাদের আরো সব বন্ধুরা এবার মাঠে দঙ্গল বেঁধে খিচুড়ি খাবে। আমিও লোভে লোভে তাদের সঙ্গে বসে পড়লাম।

সবাই দঙ্গল বেঁধে খিচুড়ি খাওয়া...

এরা সবাই থাকে জঙ্গলে ঘেরা একটা গ্রামে। বাজার করতে যেতে হয় অনেক দূরে। অসুখ করলে ডাক্তার দেখানোর কথা অনেকে ভাবতেই পারে না। আমার বেশ ভালো লাগলো গ্রামটাতে গিয়ে। ওদের সাথে কথা বলে। খিচুড়ি খাওয়া শেষ হলে জয়ন্তীরা আবার যখন পড়তে গেলো আমি নিজে নিজেই গ্রাম দেখতে বেরোলাম। আর মাঝপথে সেই টিপ টিপ বৃষ্টি নেমে এলো। ছাতাটা তখন আমার নাগালের বাইরে। একজন রাভা মহিলা আমাকে ভিজতে দেখে তার কাঠের বাড়ির নীচে বসতে বললো। রাভাদের বাড়ি কেমন হয় জানো তো সব বাড়ি কাঠের পাটাতনের ওপর। অনেকে বলেন এটা তাঁদের প্রাচীন রীতি আবার অনেকের বিশ্বাস একটু উঁচুর জন্য হাতির হাত থেকে কিছুটা হলেও বাঁচা যাবে। দেখতে পেলাম বন থেকে ফিরছেন মহিলারা। তাঁদের সবার মাথায় জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনা কাঠের বোঝা।

জঙ্গল থেকে কাঠের বোঝা নিয়ে ফিরছেন...

বাড়ি ফিরে এই কাঠ জ্বালিয়ে কেউ রান্না করবেন আবার কেউ বা হাটে বিক্রি করে সেই টাকায় চাল, ডাল, তেল, নুন কিনবেন।

আরে পায়ের বুড়ো আঙুলে কেউ যেন ঠুকরোচ্ছে। দেখলাম মুরগীর ছানার মতো কি যেন একটা ...সেটাকে কোলে তুলে নিতে আমলা রাভা বললো "দাদা ওটা ময়ূরের ছানা"।

ময়ূরের ছানা...

আমি তো অবাক ছানাটাকে কোলে নিয়ে ঘুরলাম সারা গ্রাম। দেখলাম আরো একটা অলস ময়ূর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে বাড়ির মাচার নীচে। কত বললাম একটু নাচ দেখাও তো বাছা...কিছুতেই নড়লো না।

অলস ময়ূর...

ওদিকে জঙ্গলের পথ ধরে জয়ন্তীর গ্রামের বড়রা যাচ্ছিলেন মাছ ধরতে আমিও তাদের সঙ্গে চললাম।

জঙ্গলের পথ ধরে মাছ ধরতে যাওয়া...

জলপাইগুড়ি জেলার চিলাপাতার জঙ্গলে যদি কোনো দিন যাও তাহলে আন্দু বস্তি,কোদালবস্তি,কুরমাই বনবস্তি অবশ্যই ঘুরে এসো। খুব ভালো লাগবে। আর তার সাথে তো থাকবেই নল রাজার গড়। গড়ের কথায় পরে আসছি,তোর্সার জলে আমিও নামলাম মাছ ধরতে। বর্ষার সেই ঠান্ডা জলে পা দিতেই মনটা খুশিতে ভরে উঠলো।

তোর্সার জলে মাছ ধরা...

কি কি মাছ ধরা পড়লো? আরে সবই ছোট ছোট চিংড়ি। না সেগুলোর ছবি তোলা হয়নি। কারণ তার আগেই আমাকে চলে আসতে হয়েছিলো নল রাজার গড়ে। ফেরার সময় দেখলাম বর্ষার তোড়ে ভাঙছে পাড়। পড়ে যাচ্ছে বড় বড় গাছ। মনে মনে বললাম আরো অনেক অনেক গাছ লাগাতে হবে

আমাদের...আরো অনেক অনেক সবুজ চাই।

পাড় ভাঙছে তোর্সা নদীর...

চিলাপাতা এক দুর্ভেদ্য অরণ্য। কোন এক সময়ে নল রাজারা এখানে থাকতেন। চুপি চুপি একটা গল্প শোনাই তোমাকে। এই জঙ্গল থেকে কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারে না।

জঙ্গলের মধ্যে নল রাজার গড়...

এমনকি গাছের পাতাটা পর্যন্ত না। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কেউ যদি এই অরণ্য থেকে কিছু নেয় তাহলে তার সংসারে অমঙ্গল হয়।

কেউ পাতা পর্যন্ত তুলে আনতে পারে না...

ঝিম ধরা পরিবেশে যখন ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে কানে তালা লেগে যাচ্ছে তখন আমার গাইড আমলা বলে উঠলো,"এবার বেলাবেলি বেড়িয়ে পড়ুন স্যার...পথে হাতির ভয়।" সি সি লাইন থেকে ফেরার পথে আবার টিপ টিপ বৃষ্টি। আরে ওকি...ওমা... তোর্সাতে স্নানে নেমেছে বুনো হাতি।

তোর্সাতে স্নানে নেমেছে বুনো হাতি...

এখানে আমি অনেক দিন থেকেছি। কাজ করেছি, তাই কেউ কেউ আমাকে চেনে। ক্ষিদে পেয়েছে ভেবে আমলার মা আমাদের যত্ন করে খেতে দিলেন। কি জানো? আমলার বাড়ির উঠোনে হওয়া আনারস। ফেরার পথে আমলাকে বললাম,"অনেক ধন্যবাদ আমলা। এতো মিষ্টি আনারস আমি এর আগে খাই

নি।" আমলা তখন আমাকে ঝুড়ি ভরা আনারস দেখালো। আমি ছবি তুললাম। আর মনে মনে বললাম ইস...এগুলো যদি ইচ্ছামতীর সবার সাথে বসে ভাগ করে খাওয়া যেত।

ঝুড়ি ভরা আনারস...

ওদিকে পিঁপ পিঁপ শব্দে এস এম এস আসতে শুরু করলো। সবসময় তো এখানে আর ফোনের কানেকশান থাকে না,দেখি চাঁদের বুড়ি লিখেছে,"আসার সময় কাঁঠালের কিছু ছবি এনো।" কাঁঠাল আমারও খুব প্রিয়। আরে এই তো আমার সামনেই গাছ ভর্তি কাঁঠাল। ক্যামেরা ক্লিক করলো।

গাছ ভর্তি কাঁঠাল...

সাধন রাভা এসে বললেন,"চলুন দাদা নাচের আসর বসেছে। আপনাকে সবাই ডাকছে।" গিয়ে দেখলাম এলাহি ব্যাপার। জয়ন্তী...অমল সবাই সেজে গুজে রেডি ওরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার নাচ দেখাবে।

কাঠ কাটতে যাবার নাচ

হঠাত ঘুমটা ভেঙে গেলো। ঝোড়ো হাওয়ায় জানলাটা দড়াম দড়াম করে পড়ছে। ঘুমচোখে মশারী তুলে জানলা বন্ধ করতে যাবো আর কোথা সেই অনেক চেনা ভালো গন্ধটা আমার মনটাকে খুশিতে মুড়ে দিলো।

আমার মুখে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগলো। চোখ কচলে দেখলাম জানলার পাশে কদম ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে।

জানালার বাইরে কদম গাছ...

হঠাত মনে পড়ে গেলো আজ তো বৃক্ষরোপণ উতসব। অনেকদিন আগে কবিগুরু তাঁর শান্তিনিকেতনে গাছ লাগানোর মহোতসব শুরু করেছিলেন। আমাদের পাড়াতেও ছেলে মেয়েরা আজ রাস্তার ধারে গাছ পুঁতছে আর গান গাইছে "আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল/মানবের স্নেহ সঙ্গ নে/চল আমাদের ঘরে চল..."। আমিও ওদের সাথে এতোক্ষণ গাছ পুঁতেছি...গান গেয়েছি। কাদা জল,বৃষ্টিতে আমার হাত পা ঠান্ডা। বিকেলের ট্রেনে তিনু মাসি এলেন উত্তর চব্বিশ পরগণার আড়বেলিয়া গ্রাম থেকে। ঝোলার মধ্যে বড় বড় দুটো তাল। দিদা পাঠিয়েছেন। চুপি চুপি বলি মা এখন তালের বড়া ভাজছে। আর আমি হ্যাংলার মতো বাটি, চামচ নিয়ে রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। ওই বুঝি আবার টিপ টিপ বৃষ্টি এলো।...

লেখা
কল্লোল লাহিড়ী
উত্তরপাড়া, হুগলী

ছবি
কল্লোল লাহিড়ী
ফ্লাওয়ার্সঅফইন্ডিয়া

ছড়া-কবিতা

পাঁচমারির ভোজ

তিন ধরিয়ায় তিনটে ঘোড়ায়
গাইছে খেয়াল রোজ
সেই না শুনে পাঁচমারিতে
ভালুক লাগায় ভোজ।

সেই ভোজেতে আসতে গিয়ে
ভাঙলো হাতির ঠ্যাং
শেয়াল গুলো বাজায় ঢোলক
ড্যাং ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং।

তারপরেতে জেব্রা এল
সঙ্গে এলো হায়না
নেকড়ে চিতার সঙ্গ নিল
লাল পন্ডা চায়নার।

সিংহ এল হরিণ এল
এলো বাঘ আর বাঁদর
গন্ডার আর জিরাফ এল
ঝুলিয়ে গলায় চাদর।

খাবার মেনু কি ছিলো ভাই
নেই যে রে কাজ শুনে
পান্তা ভাতে পেঁয়াজ নেবু
তিনটে লঙ্কা গুনে।

তাই নাকি সব গপ্ গপাগপ্
পেটটি পুড়ে খেয়ে

ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাংটি তুলে
পড়ল সবাই শুয়ে।

মোরগা মটন কোপ্তা কাবাব
নিদেন মাছের ঝোল
কিচ্ছুটি নেই খাবার পাতে
চাউমিন এগরোল।

মিথ্যে কথা নয়গো এসব
নয় বানানো গল্পো
আসল কথা শুনলে বুঝো
একটুও নয় কল্পো।

ওরা যে ভাই সবাই গরীব
পায়না খেতে মোটে
তাই গপাগপ্ পুড়লো মুখে
যখন যেমন জোটে।

শুভ্রজিত চক্রবর্তী
বালী, হাওড়া

গল্প-স্বল্প

বাড়ির মধ্যে বাঘ

বাঘের ছানা টিমোথিকে আমার দাদু একবার দেহরার কাছে তরাই এর জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন।

আমার দাদু শিকারি ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি শিবালিকের জঙ্গল অন্য অনেকের থেকে বেশি ভাল চিনতেন, তাই তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল এক বিশেষ দলের সাথে যেতে - এই দলে দিল্লির অনেক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন - যাতে তিনি জঙ্গল এর আনাচকানাচ সম্বন্ধে আর বাঘ দেখা গেলে বিটাররা কি করবে, বলে দিতে পারেন।

ক্যাম্পটি ছিল অসাধারন -সাতটা বিশাল বড় তাঁবু [প্রত্যেক শিকারির জন্য একটা], একটা খাবার তাঁবু আর অনেকগুলি কাজের লোকেদের তাঁবু। রাতের খাওয়া খুব ভাল হত, আর দাদু পরে স্বীকার করেছিলেন যে ওইরকম গরম জলের পাত্র, হাত ধোয়ার বাটি আর চর্ব্ব-চোষ্য খাওয়া, জঙ্গলের ভেতর তাঁবুর মধ্যে খুব একটা দেখা যায়না! কিন্তু ভাইসরয়ের আমলে এইরকমই সব ব্যাপার-স্যাপার ছিল...সঙ্গে ছিল পনেরোটা হাতি, তার মধ্যে চারটে হাওদাওয়ালা, শিকারিদের বসার জন্য, আর বাকিগুলি ছিল শিকারে অংশ নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

শিকারিরা বাঘ তো দেখতেই পেলনা, অন্য কিছুও মারল না, যদিও তারা অনেক হরিণ, ময়ূর আর বুনো শুয়োর দেখেছিল। তারা প্রায় বাঘ দেখার আশা ছেড়েই দিয়েছিল, আর শেয়ালগুলির দিকে তাক করতে বসেছিল, এমন সময় দাদু, অন্যদের থেকে একটু দূরে জঙ্গলের পথে ঘুরতে ঘুরতে, দেখতে পেলেন প্রায় আঠেরো ইঞ্চি লম্বা একটা বাঘের ছানা, একটা বটগাছের ঘন ঝুরির মধ্যে লুকিয়ে আছে। দাদু ছানাটাকে কোলে তুলে নিলেন, আর শিকার-যাত্রা শেষ হওয়ার পর সাথে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। সেইবার ওই দলের মধ্যে দাদুই একমাত্র কোন একটা শিকার নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন।

প্রথমদিকে বাঘের ছানা টিমোথিকে, যার নামকরন করেছিলেন আমার দিদিমা, খালি দুধ খাওয়ানো হত, যেটা ফিডিং বোতলে করে ওকে খাওয়াত আমাদের রাঁধুনি মাহমুদ। কিন্তু দুধ ওর পেটের পক্ষে খুব ভারি হয়ে গেল, তাই তখন ওকে কাঁচা খাসির মাংস আর কড লিভার তেল খাওয়ানো হত, আর

পরের দিকে দেওয়া হত আরো লোভনীয় ঘুঘু আর খরগোশের মাংস।

টিমোথির দুইজন সঙ্গী জুটল - টোটো নামের বাঁদর-যে কিনা মাঝে মাঝেই সাহস ভরে ওর লেজ ধরে টানতো আর টিমোথি রেগে গেলেই পর্দার ওপর চড়ে বসতো। অন্যজন ছিল একটা মংগ্রেল কুকুরছানা, যাকে দাদু রাস্তায় পেয়েছিলেন।

প্রথমদিকে টিমোথি কুকুরছানাটাকে খুব ভয় পেতো, আর ও কাছাকাছি এলেই এক লাফ দিয়ে পেছিয়ে যেত। নিজের বড় বড় সামনের পা দুটো দিয়ে কুকুরছানাটাকে ভয় দেখাতো, তারপর নিজেই ভয় পেয়ে যতদূর সম্ভব সরে যেত। শেষের দিকে অবশ্য কুকুরছানাটা ওর পিঠের ওপর চড়ে আরাম করত!

ওর সঙ্গে যারা খেলতে আসত, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াটা ছিল টিমোথির প্রিয় খেলা, আর তাই, যখন আমি দাদুর সাথে থাকতে এলাম, আমি হয়ে পড়লাম ওর প্রিয়পাত্র। ঝকঝকে দুইচোখ ভরা দুষ্টুমি নিয়ে, শরীরটাকে গুঁড়ি মেরে, ও ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতো, তারপর আমার পায়ের ওপর হটাত ঝাঁপিয়ে পড়তো, আর পিঠের ওপর গড়াগড়ি দিয়ে ফূর্তিতে পা ছুঁড়তো, আর ভান করতো যেন আমার গোড়ালি কামড়ে দেবে।

এই সময়ে ওর চেহারা প্রায় একটা বড় রিট্রিভার কুকুরের মত হয়ে গিয়েছিল, আর আমি যখন ওকে নিয়ে হাঁটতে বেরোতাম, রাস্তার লোকজন আর কাছে ঘেঁষতো না। ও যখন চেন টেনে এগিয়ে যেতো, আমার বেশ অসুবিধাই হতো ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে। বাড়িতে ওর সব থেকে পছন্দের জায়গা ছিল বসার ঘরটা, সেখানে ও আরাম করে লম্বা সোফাটার ওপর গা এলিয়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে শুয়ে থাকতো, আর ওকে কেউ সরাতে এলেই তার দিকে তাকিয়ে ফোঁসফোঁস করতো।

টিমোথি খুব পরিচ্ছন্ন ছিলো, বেড়ালের মত পা দিয়ে ঘষে ঘষে নিজের মুখ পরিষ্কার করতো। রাতে ও রাঁধুনির ঘরে ঘুমোতো, আর সকালে ছাড়া পেলে খুবই খুশি হত।

"এর মাঝে কোন একদিন" দিদিমা দৈববানীর মত ঘোষণা করতেন, "আমরা দেখবো টিমোথি মাহমুদের খাটে উঠে বসে আছে, আর ওই রাঁধুনিটার জুতো আর জামা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না।"

অবশ্যই সেরকম কিছু হয়নি, কিন্তু টিমোথি যখন প্রায় মাস ছয়েকের, তখন ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো। ওর ধীরে ধীরে মেজাজ পাল্টাতে লাগলো। আমার সাথে বেড়াতে বেরিয়ে ও চেষ্টা করতো আমাকে এড়িয়ে গিয়ে কোন বেড়াল বা কারোর পোষা পিকিনিজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। মাঝে মাঝে রাতে আমরা মুরগির ঘর থেকে ভয়ার্ত চিতকার শুনতাম, আর পরের দিন সকালে দেখা যেত সারা বারান্দা জুড়ে পড়ে আছে পাখির পালক। টিমোথিকে আরো বেশি করে বেঁধে রাখা হতো। অবশেষে যখন ও বাড়ির মধ্যে মাহমুদের ওপর হিংস্রভাবে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো, তখন দাদু ঠিক করলেন এইবার ওকে কোনো চিড়িয়াখানায় পাঠানোর সময় হয়েছে।

সবথেকে কাছাকাছি চিড়িয়াখানা ছিল লখনউতে, দুশো মাইল দূরে। নিজের আর টিমোথির জন্য একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা বুক করে - ওদের সাথে আর কেউ এক কামরায় যেতোও না - দাদু টিমোথিকে লখনউ নিয়ে গেলেন, যেখানে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ এতো স্বাস্থ্যবান এবং ভদ্র একটা বাঘ পেয়ে খুবই

খুশি হলেন।

এর প্রায় ছয় মাস পরে, যখন আমার দাদু আর দিদিমা লখনউ গেলেন আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে, তখন দাদু একদিন সময় করে চিড়িয়াখানা গেলেন টিমোথিকে দেখতে। আমি তখন ওনার সঙ্গে ছিলাম না, কিন্তু গল্পটা শুনেছিলাম দাদু দেহরা তে ফিরে আসার পর।

চিড়িয়াখানায় পৌঁছে দাদু সোজা চলে গেলেন টিমোথিকে যেই খাঁচায় রাখা হয়েছিল, তার সামনে। খাঁচার ভেতরে এক কোনায় বসে আছে,আরো বড় হয়ে গেছে, সেই বাঘ, গায়ে তার ডোরা ডোরা দাগ।

"কিরে টিমোথি!" বলে দাদু সোজা গিয়ে চড়লেন রেলিং এর ওপর, আর খাঁচার গরাদের ভিতর দিয়ে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বাঘটা খাঁচার গরাদের কাছে এগিয়ে এলো, আর দাদুকে তার মাথায় দুই হাত রাখতে দিলো। দাদু ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন, কানে সুড়সুড়ি দিলেন, আর যখনই ও গরগর করল, চটাস করে ওর মুখে মারলেন, ঠিক যেমন ভাবে আগে ওকে শান্ত করতেন।

ও দাদুর হাত চাটলো আর যখন পাশের খাঁচার থেকে একটা চিতা ওর দিকে তাকিয়ে গর্জন করলো, তখন এক লাফে ছিটকে দূরে সরে গেলো। দাদু চিতাটাকে "শুহ-হ-হ" করে তাড়িয়ে দিলেন, অমনি বাঘটা ফেরত এসে ওঁর হাত চাটতে শুরু করলো; কিন্তু মাঝে মাঝেই চিতাবাঘটা খাঁচার এদিকে ছুটে এলেই, বাঘবাবাজি আবার কোনায় দৌড় লাগাচ্ছিলো।

এই পুনর্মিলন দেখার জন্য বেশ কিছু লোক জমে গেলো আর একজন কীপার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে দাদুকে জিজ্ঞাসা করলো উনি কি করছেন।

"আমি টিমোথির সাথে কথা বলছি," দাদু বল্লেন।"ছয়মাস আগে আমি যখন ওকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে গেলাম তুমি তখন ছিলে না?"

"আমি এখানে খুব বেশিদিন আসিনি," অবাক গলায় বললো কীপারটি।"আপনি কথা বলুন। আমি তো ওকে কোনদিন ছুঁতেই পারিনি, ওর সবসময় মেজাজ গরম থাকে।"

"তোমরা ওকে অন্য কোথাও রাখছোনা কেনো?" দাদু বললেন।" ওই চিতাটা ওকে ভয় দেখায়। আমি গিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এর সাথে কথা বলছি।"

দাদু সুপার কে খুঁজতে গেলেন, গিয়ে শুনলেন তিনি সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছেন; কি আর করা, তাই দাদু চিড়িয়াখানার এদিক ওদিক খানিক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন, তারপর টিমোথির খাঁচার কাছে ফিরে এলেন ওকে বিদায় জানাতে। তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে টিমোথির গায়ে হাত বোলানো আর চাঁটি মারার পর তিনি লক্ষ করলেন অন্য একজন কীপার তাঁর দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। দাদু চিনতে পারলেন এই লোকটি টিমোথিকে নিয়ে আসার সময়ে চিড়িয়াখানায় ছিল।

"তুমি আমাকে চিনেছ," দাদু বললেন।"তুমিই নাহয় কেনো টিমোথিকে এই পাজি চিতাটার থেকে দূরে অন্য কোন খাঁচায় রাখো না?"

"কিন্তু -স্যর - "কীপারটি থেমে থেমে বললো," এটা আপনার বাঘ নয়।"

"আমি জানি, আমি জানি," দাদু একটু অভিমানভরে বললেন। "আমি জানি ও এখন আর আমার নয়। কিন্তু তুমি আমার দুই -একটা কথা শুনতেই পারো।"

"আপনার বাঘটাকে আমার খুব ভালো করে মনে আছে", বললো কীপার। "ও দুইমাস আগে মারা গেছে।"

"মারা গেছে!!" দাদু চমকে উঠলেন।

"হ্যাঁ, স্যর, নিউমোনিয়া হয়েছিল। এই বাঘটাকে মোটে গতমাসে পাহাড় থেকে ধরা হয়েছে, আর এটা খুবই ভয়ানক।"

দাদু ভেবে পেলেন না কি বলবেন। বাঘটা তখনও তাঁর হাত চাটছে, ক্রমশঃ আরো আয়েশ করে। দাদু অনেক্ষণ ধরে, যেন প্রায় এক যুগ ধরে নিজের হাতটাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন।

বাঘটার মুখের কাছে নিজের মুখটা নিয়ে গিয়ে দাদু কোনমতে বল্লেন,"গুডনাইট টিমোথি," তারপর কীপারটির দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন

রাস্কিন বন্ড
মূল গল্প- আ টাইগার ইন দ্য হাউস
ভাষ্যান্তর- মহাশ্বেতা রায়

ইচ্ছে মতন: আশ্চর্য দেশলাইকাঠি

এক কাঠুরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুনগুন করে গাইতে গাইতে চলেছিল। ওর মন ছিল খুশিতে ভরা। এর আগে এতো খুশি বোধহয় ও কোনদিন হয়নি। ওর কিছু পড়শি জঙ্গলের মধ্যে একটা নতুন অংশ খুঁজে বার করেছে- সেখানে অনেক বড় বড় আর লম্বা লম্বা গাছে ভর্তি। হাঁটতে হাঁটতে কাঠুরে পৌঁছে গেলো বনের মধ্যে সেই অংশে। ঘন জঙ্গল আর বড় বড় গাছগুলি দেখে ও মুগ্ধ হয়ে গেলো। খানিক্ষণ দেখে শুনে এবার ও ভাবতে বসলো কোন গাছটা কাটবে। আরো ভালো কাঠ খুঁজে বার করার জন্য ও জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে গেলো। হটাত ও দেখতে পেলো একটা খুব উজ্বল আলো ওর দিকে যেন এগিয়ে আসছে। সেই আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। কাঠুরে আলোর তেজ থেকে বাঁচার জন্য দুই হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো। এইভাবে খানিক্ষণ গেলো। তারপর আলোটা ধীরে ধীরে মরে গেলো। তখন কাঠুরে দেখলো ওর সামনে, ঘাসের ওপর পড়ে আছে কতগুলি পোড়া দেশলাইকাঠি। কাঠুরে তো অবাক! জঙ্গলের মধ্যে এই দেশলাইকাঠি গুলো এলো কোথা থেকে? কিছুক্ষণ আগেও তো ছিলোনা। আর ওই আলোটা?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময় ও দেখতে পেলো জঙ্গলের ভেতর থেকে সাতজন মানুষ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সবাই খুব লম্বা, গায়ে তাদের ঢোলা রেশমের আলখাল্লা, আর তাদের মুখে সুন্দর হাসি। "এই তো এইখানে" বলে তাদের মধ্যে একজন নিচু হয়ে দেশলাইকাঠিগুলি তুলে নিলো। তারপরেই তারা হটাত করে কাঠুরেকে দেখতে পেলো।

"কে তুমি? এখানে কি করছো?" গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলো একজন।

কাঠুরে হাত জোর করে বললো," প্রভু, আমি একজন গরিব কাঠুরে, ভালো কাঠের খোঁজে জঙ্গলে ঢুকেছি।" তখন তাদের মধ্যে একজন বললো, "প্রমাণ কোথায় যে তুমি কাঠুরে?" কাঠুরে তাদেরকে তার কুড়ুল আর বস্তা দেখালো। তখন সেই সাতজন মিলে কাঠুরেকে বললো -"এসো আমাদের সঙ্গে।"

সাতজনের পিছনে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে কাঠুরে দেখতে পেলো জঙ্গলের মধ্যে একটুখানি পরিষ্কার জায়গা। সাতজনের মধ্যে যে সবচেয়ে লম্বা, সে বললো- "দাঁড়াও এখানে"।
এই বলে সবাই মিলে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেলো।

কাঠুরে একলা বসে অনেক্ষন অপেক্ষা করলো। করতে করতে ভাবলো, স্বপ্ন দেখছি না তো? চারিপাশে

ঘন সবুজ জঙ্গল, আর কতরকমের গাছ – তাদের মধ্যে অনেকগুলো সে কোনদিন দেখেইনি। এমন সময়ে সেই সাতজন তার কাছে ফিরে এলো। তাদের মধ্যে একজন তার দিকে কি যেন ছুঁড়ে দিল! কাঠুরে তাকিয়ে দেখলো তার সামনে পড়ে আছে পাঁচটা পোড়া দেশলাইকাঠি।

"এগুলি কি?" জিজ্ঞাসা করলো কাঠুরে।

"এগুলি হল আমাদের অদ্ভূত সৃষ্টি। এইগুলি সঙ্গে থাকলে কেউ কোনদিন শীত বোধ করবে না। যখন খুব শীত পড়বে, তখন এইগুলোকে একসাথে ঘষলেই চারপাশটা গরম হয়ে যাবে। আমরা এইগুলির নাম দিয়েছি 'আশ্চর্য দেশলাইকাঠি'।

"কিন্তু আমাকে এগুলো দেখাচ্ছেন কেনো?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো কাঠুরে।

"আমরা তোমাকে এগুলির শক্তির কথা জানালাম। তুমি যদি আমাদের জন্য একমাস কাজ করে দাও, তাহলে আমরা এইগুলি তোমাকে দিয়ে দেবো। তোমার আর শীতে কোনদিন কষ্ট হবেনা। তুমি আমাদের হয়ে কাজ করো, তোমার বাড়িতে ঠিক খবর পৌঁছে যাবে। ওদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেটা আমরা দেখবো।"

এই কথা শুনে কাঠুরে রাজি হয়ে গেলো। কাঠুরে সেই সাতজনের কথামতো জঙ্গলের মধ্যে কাজ করতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে তাকে মাটি কোপাতে হত, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ কাটতে হত, আবার কখনও জঙ্গল পরিষ্কার করতে হত। সেই সাতজন মাঝে মাঝে এসে তার কাজ দেখে যেতো, আরো কাজ দিয়ে যেতো, আর তার খাবার দিয়ে যেতো।

এইভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর এক রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়লো। সে সাতজন এসে তখন সেই আশ্চর্য দেশলাইকাঠি গুলো ঘষলো, আর অমনি কাঠুরের খুব গরম আর আরাম লাগতে থাকলো। সেই কাঠিগুলোকে মাঝখানে রেখে সবাই তার চারিদিকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

শুয়ে শুয়ে কাঠুরের চোখে তো ঘুম আসেনা। তার মাথায় এক দুষ্টুবুদ্ধি এলো। চুপচাপ উঠে কাঠুরে দেশলাইকাঠিগুলোকে কুড়িয়ে নিলো। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে তার কুড়ুলটা অন্য হাতে নিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে দৌড় লাগালো।

পরদিন সকালে বাড়ি পৌঁছালে তার বউ আর ছেলে-মেয়ে তো খুব খুশি হল। কাঠুরে দেখলো সেই সাতজন তাদের কথামত তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল অনেক খাবার, জামা-কাপড়, আর টাকা-পয়সা। তাই তার বাড়ির সবাই বেশ আনন্দেই ছিলো। কাঠুরে কাউকে সেই দেশলাইকাঠিগুলির কথা বললো না। খুব সাবধানে তার একটা পুরোনো জামার পকেটের ভিতর রেখে দিলো।

তারপর একদিন রাতে শনশন করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে বরফও পড়তে শুরু করলো। বাড়ির সবাই যখন আগুনের পাশে বসেও শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে, তখন কাঠুরে চুপিচুপি পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই আশ্চর্য দেশলাইকাঠিগুলিকে ঘষে দিলো। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশটা আরো গরম হয়ে গেলো। কাঠুরে আর তার বউ আর ছেলে-মেয়ের আর একদম শীত করলো না। কাঠুরে ছাড়া অন্যরা অবশ্য বুঝতে পারলো না কেনো এমন হলো।

এইভাবে কেটে গেলো বেশ কয়েকটা দিন আর রাত। বাইরে বরফ পড়লেও কাঠুরের বাড়ির ভেতর

সবাই বেশ আরামে থাকলো।

তারপর একদিন রোদ উঠলো। কাঠুরে কাজে বেরোলো। কাজের পর বাড়ি ফিরে এসে সে আর দেশলাইকাঠিগুলিকে খুঁজে পেলোনা। খুব চিন্তায় পড়ে গেলো কাঠুরে। এমন সময় তার বউ এসে রাগি গলায় বললো -"আবার যদি ঘর নোংরা করো, তাহলে তোমার সব জিনিষ ফেলে দেবো, যেমন আজকে দিয়েছি তোমার পুরোনো জামার পকেটের থেকে কতগুলি পোড়া দেশলাইকাঠি!"

"কি করেছো! কোথায় সেগুলি?" চিতকার করে বললো কাঠুরে।

"অন্য ময়লাগুলোর সাথে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছি। এতক্ষনে জমাদার তুলে নিয়ে চলে গেছে" বলে বউ গটগটিয়ে চলে গেলো।

কাঠুরে রাস্তার ধারে গিয়ে আঁতিপাতি করে খুঁজলো, কিন্তু সেই চুরি করা আশ্চর্য দেশলাইকাঠিগুলিকে আর খুঁজে পেলো না।

ঋদ্ধি চক্রবর্তী
অষ্টম শ্রেণী
দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল
কলকাতা

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৪

পর্ব চার

গত সংখ্যায় সন্ধ্যাবেলার ভাল লাগার কথা বলেছিলাম, এবারসন্ধ্যার খারাপ লাগার কথা বলি। ছোটবেলায় প্রায় সবাই একটু ভিতু থাকে বোধ হয়,তাই না? আমিও ছিলাম।
লন্ঠনের আলোয় ঘরের দেওয়ালে পড়া লম্বা লম্বা ছায়াগুলো দেখলে গা ছম ছম করত। দাদুর কাছে শোনা গল্পের মধ্যে কোনটা ভূতের হলে তো কথাই নেই। দিয়ানীর কোলে সেঁধিয়ে যেতাম একেবারে।

পড়া হয়ে গেলে রোজই ছিল দাদুর কাছে গল্প শোনা। কাজ সেরে বড়রা একে একে জড়ো হতেন দাদুর ঘরের দাওয়ায়। দাদু আলবোলায় গুরুক গুরুক করে তামাক খেতেন। নানা রকমের কথা হত সে সময়।

কি একটা পাখি এক নাগাড়ে কুঁক কুঁক করে চলত। একঘেয়ে ঐ ডাকটাকে কেন জানিনা ভয় পেতাম দারুন।

দাদুর একটা বন্দুক ছিল। সেটা ছিল গ্রামের মানুষের বল ভরসা। কোনো বিপদ আপদ হলেই তারা দাদুর কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে আসত।

একবার কি হয়েছিল শোনো। ক'দিন ধরে শোনা যেতে লাগল কি একটা জানোয়ার এসেছে গ্রামে। বিটকেল দেখতে। খরগোশের মত বড়। গায়ে বড় বড় কাঁটা, দৌড়লে নাকি ঝুম ঝুম করে আওয়াজ হয়। তাড়া করলে গর্তে বা ঝোপ ঝাড়ে লুকিয়ে পড়ে।

মাতব্বরেরা দাদুর কাছে এলেন এই আবেদন নিয়ে যে ওটাকে মারতে হবে। সব কিছু শুনে দাদু বললেন যে ওটা সজারু হতে পারে। নিরীহ প্রানী, কোনো ক্ষতি করবে না। তাই মারবার দরকার নেই।

কিন্তু কে শোনে সে সব কথা।সবার এক অনুরোধ ওটাকে মারতে হবে। অগত্যা দাদু রাজী হলেন।

একদিন বিকেলের দিকে কয়েকজন লোক এসে দাদুকে ডেকে নিয়ে গেল।সন্ধ্যের মুখে মড়া জানোয়ারটাকে নিয়ে অনেকেই এলেন আমাদের বাড়ীতে।কৌতুহল নিয়ে দেখতে গিয়ে ভয়ে গুটিয়ে গেলাম। গায়ে বড় বড় কাঁটাওয়ালা ছিন্ন ভিন্ন জন্তুর মরদেহ থেকে বিকট দুর্গন্ধ বেরচ্ছে। ঐ সব দেখে শুনে আর গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল একেবারে। দিয়ানীর আঁচল ধরে পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে দুচোখ ভরে

জল এলো। সজারুটার জন্য তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

অনেকেই বলাবলি করছিল যে ওর একটা জোড়া থাকা সম্ভব। সেদিন সন্ধ্যা থেকে কোন শব্দ হলেই কেবলই মনে হত যে জোড়ার অপর সজারুটা এসেছে বোধ হয়। এই বোধ হয় তেড়ে কামড়াতে এল বা ভয়ংকর কাঁটা ফোটাতে এল। আর ঐ বোঁটকা গন্ধটা যেন নাকের সাথে লেপ্টে আছে। কত দিন যে ছিল!

সজারু সম্পর্কে কিছু কথা এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি। এ সব তখন জানতাম না পরে জেনেছি।ওদের গায়ে যে কাঁটা হয় সেগুলো তিন চার ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। আর খুব ছুঁচলো। আমার কাছে ঐ কাঁটা কয়েকটা অনেক দিন ছিল, এখন হারিয়ে গেছে। সজারু ভয় পেলে নিজের শরীরটাকে গুটিয়ে কাঁটাওয়ালা গোল বলের মত করে ফেলে যাতে কেউ আক্রমন করতে না পারে। করতে এলে সে কাঁটার খোঁচা খেয়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু শেয়াল ভারি চালাক। সজারুর মাংস খেতে খুব ভালবাসে। সে কাঁটার বলের মত সজারুকে সাবধানে ঠেলে ঠেলে কোন পুকুর বা জমা জলের মধ্যে ফেলে দেয়। সজারু ডুবে যাবার ভয়ে হাত পা ছড়িয়ে সাঁতার দিতে গেলে শেয়াল আক্রমন করে তাকে মেরে ফেলে।

যাক যে কথা বলছিলাম। দাদুর দাওয়ায় সন্ধ্যার আড্ডার মধ্যেই আমার খাবার ডাক পড়তো সবার আগে। সবার ছোটো কিনা তাই। দাদুর ঘরটা ছিল বড় উঠোনের এক ধারে। আর রান্নাঘর ছিল ভেতরের উঠোনে। দাওয়ায় সবাই বসে থাকত তাই নির্ভয়ে এক দৌড়ে গিয়ে খেয়ে আবার এক দৌড়ে ফিরে আসতাম।

কিন্তু মুশকিল হত এর পর। বড়দের খাবার ডাক পরলে।সবাই চলে যেত রান্নাঘরে। আমি একা শুয়ে থাকতাম দাদুর ঘরে দিয়ানীর খাটে। ভয় পেতাম খুব। হয়ত একটা শেয়াল ডেকে উঠল কোথাও বা অন্য কোন শব্দ হল, আর সেই পাখিটা ডেকেই চলত। চমকে চমকে উঠতাম।

এই সময় রোজই প্রায় ঘড়ি ধরে আসার মত আসত প্রানগোপাল দা। হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে আর তালে তালে গান গাইতে গাইতে সে আসত। কোথা কোথা থেকে যাত্রা দেখে এসে সেই সব গান গাইত উচ্চকন্ঠে। অনেক দূর থেকে তার আসার আওয়াজ পাওয়া যেতো এতে। ও যেত বড় উঠোন দিয়ে। এক দিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যেত। এটা ছিল ওর শর্টকাট। ওর গান গাওয়া আর লাঠি ঠোকার শব্দে আমার ভয় অনেকটাই কেটে যেত।

প্রানগোপালদা'র কথা আগে বলা হয়নি। আমাদের বাইরের উঠোনের পাশে ছিল কাছারিঘর। তার একটা অংশে ছিল একটা মুদিখানা। হরেন মামাকে মুদিখানাটা করতে দিয়েছিলেন দাদু। প্রানগোপালদা ছিল তারই ভাগ্নে। সে রোজ রাতে মামার দোকানে শুতে আসত দোকান পাহারা দিতে। আমার সাথে ওর খুব ভাব ছিল।

এর পর নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে যেত। ভাঙত সেই সকালে, ঘুঘুর ডাকে ---- যে ডাকের কথা প্রথমেই বলেছিলাম।

একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। এখানে যেসব ঘটনার কথা বলছি সে সব ঘটেছিল আমার প্রায়

ছয় থেকে দশ বছর বয়সের মধ্যে আমার মামার বাড়িতে।

কোনটা আগে আর কোনটা পরে সেটা আর এ বয়সে মনে নেই। থাকার কথাও নয়।

যতটা সম্ভব ক্রমানুসারে বলে যাবার চেষ্টা করছি।

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়নপুর, বর্ধমান

পড়ে পাওয়া: ভুলোর ভুল

নরম ঘাসের উপর রোদে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে ছিল ভুলো,হটাত চমকে উঠে চোখ মেলে যা দেখল, তাতে তার চোখদুটো ছানা-বড়া হয়ে গেল। কানদুটো শেয়ালের কানের মত খাড়া হয়ে উঠলো, সারা শরীর শিউরে উঠে গায়ের লোমগুলো কাঁটার মত দাঁড়িয়ে উঠল!

ওরে বাবা! ওটা কীরে? এত বড় পোকা তো সে জন্মে কখনো দেখেনি। ছোট ছানা হলে কি হয়, ভুলোর সাহস আর গায়ের জোর তো কারো চেয়ে কম নয়, কত বড় বড় ইঁদুর সে মারে, কাক-চিল-চড়াই কাউকে বাগানের কাছে বসতে দেয় না, কুকুর বেড়াল কিম্বা অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু এই যে তার মাথার সমান বড়, গুবরে পোকার মত দেখতে পোকাটা থ্যাবড়া ভাবে কুরকুর করে হেঁটে তার দিকে এগিয়ে আসছে এটাকে দেখে তার বুকটা টিপটিপ করছে, পিছনের পা দুটো কাঁপছে, লেজটা গুটিয়ে আসছে! তবু প্রাণপণে মনের জোর করে চোখ বুজে মারল এক চাঁটি। ...

এরপর কি হল জানতে চাও? তাহলে পড়ে ফেল 'ভুলোর ভুল'। বইয়ের নাম "ছোট্ট ছোট্ট গল্প", লেখিকা পুণ্যলতা চক্রবর্তী।

ছোট্ট ছোট্ট গল্প
পুণ্যলতা চক্রবর্তী
আনন্দ পাবলিশার্স
৬০ টাকা

গত সংখ্যায় পেয়েছি: সত্যজিত রায়

ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু, প্রোফেসর শঙ্কু, তারিনী খুড়ো, মুকুল,ক্যাপ্টেন স্পার্ক, বাতিকবাবু, অসমঞ্জবাবু, নকুড়বাবু, মগনলাল মেঘরাজ, ফটিকচাঁদ, মোল্লা নাসিরুদ্দিন...এদের কাউকে কাউকে তুমি বেশ ভালো করেই চেনো, কাউকে বা একটু কম চেনো। বলতো এদের সবার নাম গুলো এক সাথে বলছি কেনো? বুঝতেই পেরে গেছো এতক্ষনে- গত সংখ্যায় আমরা যাঁর ছোটবেলার কথা একটুখানি পড়েছিলাম, এখন আমরা তাঁকে নিয়ে গল্প করবো। তিনি সত্যজিত রায়। সত্যজিত রায়ের সম্পর্কে তুমি নিশ্চয় কিছু কিছু, বা অনেক কিছু খবর রাখো। এসো, আরেকবার একটু তাঁর কাজকর্ম নিয়ে কথা বলি।

তিনি ফেলুদা, তোপসে আর জটায়ুর সৃষ্টিকর্তা। ফেলুদা কে জানোতো? ফেলুদা হল আসলে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, তোপসে হল তার খুড়তুতো ভাই আর সাকরেদ, আর জটায়ু হলেন তাদের বন্ধু। এই তিনজনে মিলে গোয়েন্দাগিরি করে সাঙ্ঘাতিক সব অপরাধের সমাধান করে ফেলে। ফেলুদার একটা সত্যিকারের রিভলভার আছে যদিও, কিন্তু ফেলুদার আসল অস্ত্র হল তার বুদ্ধি- যাকে সে বলে"মগজাস্ত্র"। এইখানে জটায়ুকে নিয়ে না বললে অন্যায় হবে। জটায়ুর আসল নাম হল লালমোহন গাঙ্গুলি। তিনি একজন জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনির লেখক, আর তাঁর একটা সবুজ রঙের গাড়ি আছে। তাঁর হিরোর নাম হল প্রখর রুদ্র!! সেই প্রখর রুদ্র আবার সাড়ে-ছয়ফুট লম্বা!! আর তাঁর লেখা দুই একটা বই এর নাম শুনবে নাকি? -'সাহারায় শিহরণ', 'হন্ডুরাসে হাহাকার', 'ভ্যাঙ্কুভারের ভ্যাম্পায়ার'!! -কি, নাম শুনেই মনে হচ্ছে তো বেশ গা-ছমছমে জমজমাট ব্যাপার-স্যাপার?

ফেলুদা আর তোপসে

ওদিকে আবার আছেন প্রোফেসর শঙ্কু। তাঁর পুরো নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। তিনি গিরিডি তে থাকেন, তাঁর একমুখ সাদা দাড়ি আর চোখে গোল চশমা; তাঁর বাড়ির কাজের লোকের নাম প্রহ্লাদ, তাঁর পোষা বেড়ালের নাম নিউটন, আর তাঁর তৈরি করা রোবটের নাম বিধুশেখর। সে আবার "ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা" গাইতে পারে! তিনি নানারকম দারুণ দারুণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। তাঁর তৈরি 'মিরাকিউরল' বড়ি, একমাত্র সর্দি ছাড়া সব অসুখ সারাতে পারে। তাঁর 'বটিকা ইন্ডিকা' যদি একটা মাত্র খাও, ব্যস, পেট এমন ভরে যাবে যে আর খিদেই পাবে না। আর আছে 'অ্যানাইহিলিন' -সেটাকে শত্রুর দিকে তাক করলেই শত্রু বিনা রক্তপাতে ভ্যানিশ হয়ে যায়। এইরকম আরো সব দুর্ধর্ষ আবিষ্কার করেছেন তিনি। মাঝে মাঝেই তিনি দেশে -বিদেশে নানারকম অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর প্রিয় দুই বৈজ্ঞানিক বন্ধু হলেন সন্ডার্স আর ক্রোল।

নিউটন কে কোলে নিয়ে প্রোফেসর শঙ্কু

সত্যজিতের আরেকজন বিখ্যাত চরিত্র হলেন তারিনী খুড়ো। তিনি বেনেটোলা লেনে থাকেন। সারাজীবন নানারকমের কাজকর্ম করেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রান্তে। তারিনী খুড়ো তাঁর সেইসব অদ্ভূত মজাদার, মাঝে মাঝে ভয়াবহ সব অ্যাডভেঞ্চারের কথায় শোনান তাঁর স্কুল পড়ুয়া শ্রোতাদের।

নিজের লেখা এই সমস্ত গল্পগুলির জন্য ছবি আঁকতেন সত্যজিত নিজেই। শুধুমাত্র ফেলুদা বা প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়েই নয়, আরো নানারকমের ছোট ছোট অনেক গল্প লিখেছেন তিনি। সব গল্প, আর গল্পের বই গুলির প্রচ্ছদ, সব নিজে আঁকতেন তিনি। 'সন্দেশ' পত্রিকা আর অন্য অনেকের বইয়ের জন্য ও ছবি এঁকে দিয়েছেন তিনি। তোমার কাছে যদি সত্যজিত রায়ের কোন গল্পের বই থাকে, বা অন্য বই যেখানে ওনার গল্প আছে, সেইখানে ছবিগুলিকে দেখো মন দিয়ে, দেখবে ওনার সই আছে ছবির নীচে। জানো কি, সত্যজিত তৈরি করেছিলেন অনেকগুল বাংলা এবং ইংরাজি টাইপফেস। টাইপফেস মানে হল বর্নমালার অক্ষরগুলিকে একটা বিশেষ স্টাইলে দেখানো। তাঁর তৈরি করা 'রে রোমান' আর ' রে বিজার' নামে টাইপফেস দুটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলো। আর 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্যেও তিনি তৈরি করেন অনেকগুলি টাইপফেস।একেকবার একেক রকমভাবে 'সন্দেশ' এর লোগো ছাপা হত।

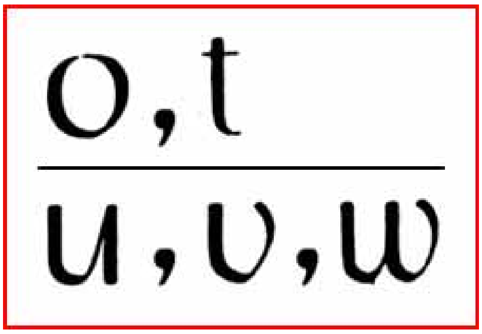

রে-রোমান

রে বিজার

সন্দেশ এর জন্য নানারকম লোগো

সত্যজিত তো প্রথমে কাজ করতেন ডি যে কীমার নামের বিজ্ঞাপনের অফিসে। সেখানে কাজ করতে করতেই ১৯৫৫ সালে তৈরি করেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালি'। তারপর তো আরো অনেক ছবি তৈরি করেছেন। তার মধ্যে ছোটদের জন্য আছে 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'হীরক রাজার দেশে', 'গুপি বাঘা ফিরে এল'। তুমি কি এই ছবিগুলি দেখেছো? না দেখে থাকলে শিগগির দেখে ফেলো। ভূতের রাজার দেওয়া তিন বরের সাহায্যে গুপি আর বাঘা, দুজনে মিলে কিভাবে দুষ্টু লোকেদের শায়েস্তা করে ফেলে, তারি টানটান গল্প বলা আছে এই ছবিগুলিতে। গু -গা-বা-বা ছবিগুলিকে শুধুমাত্র পরিচালনা করেন নি তিনি, সেই ছবিগুলির সব অসাধারন গানগুলি লিখেছিলেন এবং সুর ও দিয়েছিলেন তিনি। আছে ফেলুদার গল্প নিয়ে 'সোনার কেল্লা' আর 'জয় বাবা ফেলুনাথ'।

সত্যজিত রায়ের সম্পর্কে আরো অনেক অনেক কথা বলার আছে। সব কথা তো এখানে বলার জায়গা নেই। তবে একটা বিষয়ে বলে শেষ করি। এই যে এত এত কাজ করতেন- গল্প লেখা, ছবি আঁকা, সিনেমা তৈরি করা, গান লেখা, সুর দেওয়া - কি করে এতসব এত সুন্দর ভাবে করতেন বল তো? - এর রহস্যটা কোথায় জানো? - ছোট্টবেলা থেকেই কাজের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব খুব মনোযোগী। বড় হয়েও তাঁর সঙ্গে সবসময় থাকতো একটা লাল মলাটের খেরোর খাতা। এই খাতায় তিনি সব হোমওয়ার্ক করে রাখতেন। ভাবছো হোমওয়ার্ক তো স্কুলে করতে হয়, বড়দের আবার হোমওয়ার্ক কি? -আসলে কি জানো, বড়দের ও খুব ভালো কাজ করতে গেলে আগে থেকে হোমওয়ার্ক করতে হয়। ওই যে বলছিলাম খেরোর খাতা, সেই খাতাতে কি লেখা থাকতো জানো?- তাঁর সব ছবিগুলির চরিত্র, তাদের চেহারা কেমন হবে, কি পোশাক পড়বে, চারিপাশে কি থাকবে, কিভাবে ছবি তোলা হবে - সব কিছু আগে থেকেই লিখে, এঁকে রাখতেন তিনি। এইরকম আরো অনেক খুঁটিনাটি তথ্যে ভরা ছিলো সেই খাতা। এতো ভালো করে হোমওয়ার্ক করতেন বলেই এতো নিখুঁতভাবে তৈরি করতেন পারতেন তাঁর ছবিগুলিকে।

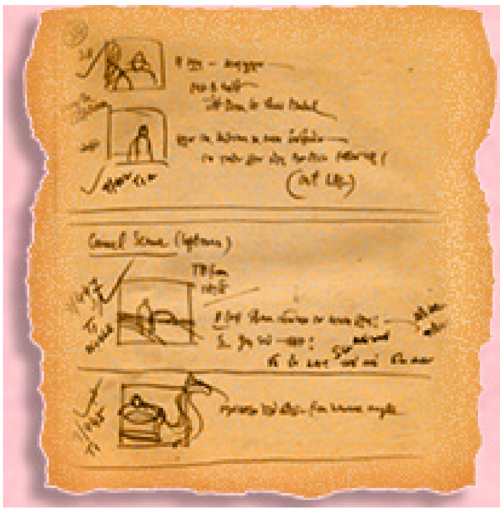

বিখ্যাত সেই লাল মলাটের খাতা [বাঁ দিকে] আর তাঁর লেখা চিত্রনাট্যের পাতা

একেই বলে হোমওয়ার্ক!

আমাদের সবার প্রিয় এই মানুষটির জন্মদিন ২রা মে। আর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান ১৯৯২ সালের ২৩শে এপ্রিল। বিশ্ববিখ্যাত এই ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা মানুষটিকে তাঁর বন্ধুরা মজা করে কি নামে ডাকতেন জানো? -'ওরিএন্ট লংম্যান' - মানে পূর্বদিকের লম্বা মানুষ!!

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী

ছবি
সত্যজিতরায়ওয়রল্ড
নেশনমাস্টার
থ্রিলিংডিটেকটীভ

মনের মানুষ: হাসি-খুশি

আমাদের এবারের সংখ্যার মনের মানুষ দুই বোন - হাসি আর খুশি। একশো নম্বর গড়পাড় রোডের উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির প্রথম দুই সন্তানের নাম ছিল রবি ঠাকুরের গল্প 'রাজর্ষি'র দুটি চরিত্রের নামে- 'হাসি' আর 'তাতা'। হাসি নাম হলে কি হবে, তাতার বড়দিদি হাসি কিন্তু মোটেও সবসময় হাসত না। বরং একটু গম্ভীরই থাকত বেশিরভাগ সময়। হাসির নামের সঙ্গে নাম মিলিয়েই রাখা হয়েছিল পরের বোনের নাম - 'খুশি'। ভাবছো এই নামে তো কোন লেখিকার নাম শোননি! আসলে এদেরকে চেন ঠিকই, তবে পোষাকি নামে। 'তাতা' হলেন হাসির রাজা সুকুমার রায়, 'হাসি' হলেন তাঁর দিদি সুখলতা রাও, আর 'খুশি' হলেন তাঁদের মেজ বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী।

নিজেদের পরিবারের ধারা বজায় রেখে, হাসি আর খুশি, মানে সুখলতা আর পুণ্যলতা দুজনেই কিন্তু সফল শিশু-সাহিত্যিক ছিলেন। সুখলতা শিশুদের জন্য অনেক অনেক গল্প, কবিতা, ছড়া রচনা করেন। 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত বেরোত। লেখার সাথে আঁকতেন সাদা-কালো বা রঙিন ছবি। তাঁর লেখা একটা খুব জনপ্রিয় ছড়া শুনবে নাকি?

দিগনগরের বুড়ি এল,
তিনটি মেয়ে মুঠোয় ধরে;
একটি সেঁকে, একটি বাড়ে,
একটি ভাল রান্না করে,
মিহি সুতো কাটতে পারে,
ঘরের কাজও করতে পারে;
ও গিন্নীমা, কিনবে নাকি
একটি মেয়ে, আদর করে?

শুধুমাত্র ছড়া বা গল্প নয়, সুখলতা নিজে ছোটদের জন্য গানও লিখতেন আর তাদের সুরও করতেন।

ছোটদের জন্য একদম নতুন পদ্ধতিতে নিজে ছবি এঁকে দুটো পড়ার বই লিখেছিলেন তিনি। এই বই দুটির নাম হল 'নিজে পড়' আর 'নিজে শেখ'। 'নিজে পড়' বইটির জন্য তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে 'কাইজার-এ-হিন্দ' সম্মান লাভ করেন।

সুখলতার বিয়ে হয় কটকের ডঃ জয়ন্ত রাও এর সাথে। তিনি সারাজীবন কটকে নানারকম সমাজসেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

শুধু বাংলা ভাষাতেই নয়, ইংরাজি ভাষাতেও বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন তিনি। তাঁর লেখা 'গল্পের বই' আর 'আরো গল্প' - এই বই দুটি একত্র করে এখন 'গল্প আর গল্প' নামে প্রকাশ হচ্ছে। এই বইটির মধ্যে নানা জনপ্রিয় দেশি- বিদেশি রূপকথার সংকলন আছে।

সুখলতার বোন পুণ্যলতা খুব বেশি লেখেননি। তবে যেটুকু লিখেছিলেন, তা ছিল সরস, সুন্দর ছোটদের মনের মতন সব লেখা। সন্দেশ পত্রিকাতে তিনি 'গাছপালার কথা' নামে প্রবন্ধ লিখতেন যাতে গাছপালা নিয়ে নানারকম তথ্য থাকত। শেষ বয়সে তিনি লিখেছিলেন তাঁর ছোটবেলার স্মৃতিকথা নিয়ে 'ছেলেবেলার দিনগুলি'। আর লিখেছিলেন একদম ছোট্টদের জন্য গল্পের বই 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প'। এই বইয়ের গল্প গুলি কিন্তু সত্যিই খুব ছোট্ট ছোট্ট আর খুব ভাল, সবে যারা পড়তে শিখেছে, তাদের জন্য। এই বইটার উপরি পাওনা হল তাঁর ভাইপো সত্যজিত রায়ের আঁকা ছবি।

এবার তাহলে খুব তাড়তাড়ি কিনে পড়ে ফেল সুখলতার 'গল্প আর গল্প'। আর তোমার যদি ছোট্ট ভাই বা বোন থাকে তাহলে তার জন্য কিনে ফেল পুণ্যলতার 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প'। বই গুলো পড়া হয়ে গেলে আমাকে জানাতে ভুলো না কিন্তু...ইচ্ছে হলে দু-এক লাইন লিখেও ফেলো...আর পাঠিয়ে দিও ইচ্ছামতীকে।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী

দেশে-বিদেশে: বেড়িয়ে এলাম ফুলিয়াপাড়া

'...রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারারাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ-মাস যায়...'

বলতো কোন গল্পের অংশ এটা? - আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, এটা হল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পের একটা অংশ। সেই গল্পের রাজা নিজের সুয়োরানীর জন্য এই শাড়ি সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কিনে এনেছিলেন!!

ভাবছো, একটা শাড়ির দাম সা-আ-আ-ত জাহাজ সোনা? তাই কখনও হয়? - আসলে ওটা তো রাজকন্যার শাড়ি, তাই মনে হয় অত দাম। তবে সত্যি কথাটা কি জানো, একটা সুন্দর নক্সা করা শাড়ি বুনতে কিন্তু সত্যি অনেক সময় লাগে - ছ-মাস না হলেও এক থেকে তিন মাস তো লাগতেই পারে। আর সেইজন্যই, হাতে বোনা শাড়ি, যাকে তাঁতের শাড়ি বা হ্যান্ডলুম [handloom] এর শাড়ি বলা হয়, সেগুলি কিন্তু মেশিনে বোনা শাড়ির থেকে বেশি দামী হয়।

ভাবছো, শাড়ি তো বড়দের ব্যাপার, তাই নিয়ে ইচ্ছামতীতে এতো গল্প কেনো? আসলে, আজকে আমি তোমাকে শোনাবো শাড়ি তৈরির গল্প। এই গল্পে কিন্তু কোন রাজকন্যা শাড়ি বোনে না, বোনেন হাজার হাজার দক্ষ কারিগর। আর কারিগরদের নানারকম ভাবে সাহায্য করার জন্য থাকেন আরোও নানা মানুষ। আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের কাপড় বোনার নিজস্ব ধারা আছে। কারোর কাপড় হয় ফুরফুরে হাল্কা, কেউ বোনেন জমকালো রঙ্গিন নক্সা, কোথাও আবার জরির কারিকুরি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় নানারকমের তাঁতের শাড়ি - শান্তিপুরি, ফুলিয়া, ধনেখালি - এগুলি কিন্তু এককেটা জায়গার নাম - একেক জায়গার শাড়ি এককেরকমের হয়, তাই জায়গার নাম দিয়ে বাহারের তফাত বোঝানো হয়। তবে আদতে মোটামুটি সব জায়গাতেই তাঁতের ব্যবহার প্রায় একইরকম।

আমি কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার ফুলিয়ায় বেড়াতে গেছিলাম। সেইখানে আমার এক পারিবারিক বন্ধুর সাথে আমি বেড়াতে যাই ফুলিয়াপাড়ায়। ফুলিয়াপাড়া হল এমন এক জায়গা, যেখানে

প্রায় সবাই তাঁতী। প্রত্যেক বাড়িতেই তাঁত আছে। পুরুষরাই বেশিরভাগ তাঁতযন্ত্র চালান, আর বাড়ির মহিলারা নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করেন, এমনকি ছোটরাও বাদ যায়না।ফুলিয়াপাড়ার একজন তাঁতীভাই আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন কিভাবে একটা তাঁতের শাড়ি তৈরি হয়।

শাড়ি তৈরি করতে কি লাগে? -অবশ্যই নানা রঙের সুতো এবং ইচ্ছা হলে নক্সা করার জন্য জরি। এই সুতো কিন্তু আসে গুজরাতের সুরাট থেকে, আর জরি আসে মহারাষ্ট্র থেকে। সেই কোরা সুতোর লাছিগুলিকে প্রথমে মনোমত রঙ করে নেওয়া হয়।

রঙিন সুতোর লাছি

নক্সা করার জন্য জরি

তারপর শুরু হয় সেই সুতোগুলিকে ঠিকমত করে গোটানো। এই কাজটি দুই ধাপে হয়, আর বাড়ির মহিলারাই এই কাজ বেশি করেন। প্রথমে, সুতোগুলিকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে গোটানো হয়

সুতো পাকানোর প্রথম ধাপ

তারপর সেইগুলিকে আবার দ্বিতীয়বার আরো মিহি করে চরকা কেটে গোটানো হয় আর ছোট ছোট তকলি বানানো হয়।

দ্বিতীয় ধাপে গোটানো সুতো থেকে কাটা হচ্ছে তকলি

তকলি

এরপর শুরু হয় শাড়ি তৈরির পালা। একটা সম্পূর্ন তাঁতযন্ত্রের অনেকগুলি অংশ থাকে। একদিকে থাকে একটি বিশাল রোলার। আরেকদিকে বসে থাকেন তাঁতীভাই। এর আগে যে তকলি গুলির কথা বললাম, সেই, তকলি গুলিকে ডিজাইন অনুযায়ী লাগানো হয় একটি লম্বা কাঠের ফ্রেমে। ফ্রেমে লাগানো তকলি থেকে সুতো ওই রোলার এর ওপর জড়িয়ে গিয়ে, আরো নানা পথ ঘুরে, পড়ে তাঁতীভাইয়ের হাতে। ব্যাপারটা যত সহজে বলে ফেললাম, মোটেও তত সহজ নয়। নিচের ছবিগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে।

ফ্রেমএ লাগানো তকলি

রোলার -এই রোলারটি ছবি তোলার সময় ব্যবহার হচ্ছিল না

তাঁতযন্ত্র - সামনে তাঁতীভাইয়ের বসার জায়গা

এর মধ্যেই আবার কোন এক জায়গায় থাকে কার্ডবোর্ডের পাঞ্চ কার্ড। এই পাঞ্চ কার্ডএর মধ্যে ফুটো, বা পাঞ্চ করে বানানো থাকে শাড়ির পাড়ের নক্সা। তকলির থেকে সুতো নানা কলকব্জার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে এই পাঞ্চ কার্ডের মধ্যে দিয়েও যায়। আর তাতেই, ঠিক যেনো ম্যাজিকের মত, শাড়ির পাড়ে ফুটে ওঠে নানান নক্সা।

শাড়ির পাড়ের নক্সা করার জন্য পাঞ্চ কার্ড

একজন দক্ষ তাঁতীর কিন্তু তাঁত চালানোর সময় হাত এবং পা দুই সমান ভাবে ব্যাবহার করতে হয়। আর আরেকটা জিনিষের কথা তো আলাদা করে বলতেই হবে। সেটা হলো মাকু।

মাকু

সেই যে একটা প্রবচন আছে-'মাকুর মত এদিক ওদিক করা ' -মাকু কিন্তু সত্যি সবসময় এদিক-ওদিক করে। তাঁতীভাইয়ের হাতের একটা খুব জরুরি যন্ত্র হল মাকু। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখো, একেকটি মাকুর মধ্যে জড়ানো আছে একেক রঙের সুতো আর জরি। এই মাকু ধরেই এপাশ- ওপাশ

ক্রমাগত হাত নাড়িয়ে ধীরে ধীরে বুনে চলেন একটি শাড়ি। আর সেই হাত সে কত তাড়াতাড়ি নড়ে, সেটা চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। কোন ছবি সেই গতিকে দেখাতে পারবে না।

তাঁতীভাই

এককেটা শাড়ি বানাতে সময় লাগে প্রায় একমাস। শাড়ির কারুকাজ যত বেশি হবে, বানাতে তত বেশি সময়ও লাগবে।

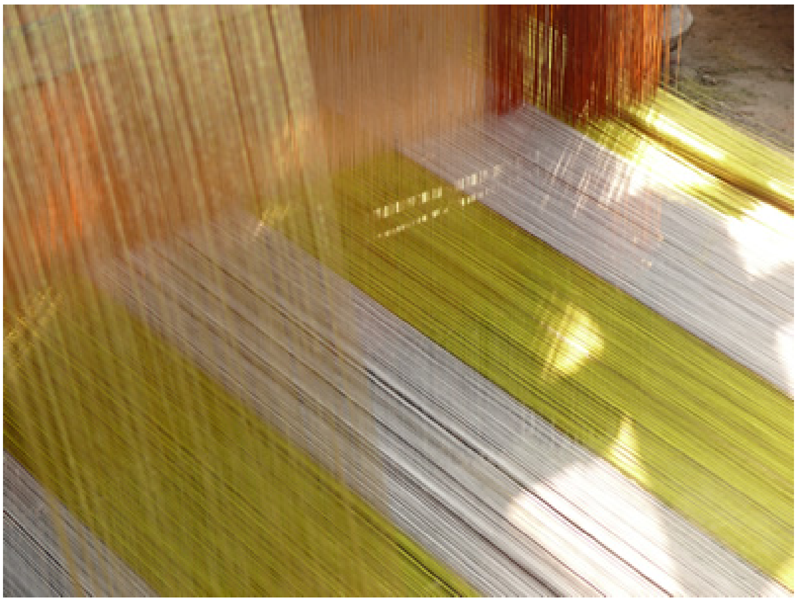

অর্ধেক বোনা শাড়ি

ফুলিয়ার শাড়ি খুব হাল্কা হয়, গরমকালে পড়তে খুব আরাম হয়। আজকাল অন্যান্য ভারতীয় হাতে বোনা কাপড়ের মত, ফুলিয়ার কাপড়ও দেশে বিদেশে খুব কদর পাচ্ছে। ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সে,

ফুলিয়ায় বোনা তাঁতের কাপড় এবং ওড়না/স্টোল নিয়মিত রপ্তানি হয়।

থাকদিয়ে রাখা তৈরি শাড়ি

কেমন লাগলো এই শাড়ি বোনার গল্প? এটা কিন্তু আমাদের দেশের এই বিশাল শিল্পের একটা খুব ছোট্ট গল্প। আমাদের রাজ্যের রেশমের শাড়ি বালুচরী আর বিষ্ণুপুরি, বাংলাদেশের জগতবিখ্যাত জামদানি - এদেরকে নিয়ে তো কোন গল্পই হল না। এদের প্রত্যেকের একেকটা নিজস্বতা আছে, আর প্রত্যেকটা শাড়ির পেছনে থাকে কোন একজন দক্ষ শিল্পীর পরিশ্রম। তুমি বরং এক কাজ করো - মা'কে বলো আলমারিটা খুলতে, আর মায়ের শাড়িগুলোর মধ্যে থেকে বেছে দেখতো - কোনগুলি হাতে বোনা আর কোনটা মেশিনে বোনা, বুঝতে পারো কিনা!

লেখা ও ছবি
মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
শ্রী নিমাই সরকার, ফুলিয়াপাড়া
শ্রীমতি সোমা ঘোষ, কলকাতা

ছবির খবর: দ্য ব্লু আমব্রেলা

হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটা গ্রামে থাকে বীণা। পড়ার সাথে সাথে সে বাড়ির অনেক কাজ করে দেয়,বন্ধুদের সাথে খেলে আবার রাগ হলে ঝগড়া করতেও ছাড়ে না।

বীনা

তাদের গ্রামটা খুব সুন্দর তাই মাঝে মাঝেই ট্যুরিস্টরা সেখানে ঘুরতে আসে, সবার ছবি তোলে...গ্রামের বাইরের মাঠে তখন যেন এক জমজমাট আসর বসে। আর সেই সময় নন্দকিশোরের ফূর্তি দেখে কে। ও নন্দ কিশোরকে তুমি চেনো না বুঝি? নন্দকিশোর হল এক মুদি। যার দোকান থেকে গ্রামের মানুষরা সারা বছর কেনাকাটা করে আর নন্দকিশোর মাঝে মাঝেই সেই গ্রামের লোকদের সাথে খারাপ

ব্যবহার করে,পয়সার গরম দেখায়। বিদেশীদের ডেকে ডেকে গরম কোকাকোলা খাওয়ায় আর বলে যে তার তো ফ্রিজ নেই তাই ঠান্ডা করবে কোথা থেকে?

নন্দকিশোর

জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী এই ধরনের গ্রামে যদি তুমি কোনোদিন যাও তাহলে দেখবে সেখানকার বেশিরভাগ মানুষই খুব গরীব,কষ্ট সহিষ্ণু। কারণ তাদের কাছে পৌঁছোয় না জীবন ধারণের প্রাথমিক সুযোগটুকুও। এই রকমেরই একটা গ্রামের মেয়ে বীণা। যার গলায় ভাল্লুকের নখ দিয়ে তৈরী একটা মাঙ্গলিক লকেট দেখে এক জাপানী ট্যুরিস্টের খুব পছন্দ হবে আর সে তার নীল রঙের ছাতার বিনিময়ে লকেটটা নিয়ে নেবে। বাড়িতে ফিরে বীণা অবশ্য বকুনি খাবে কিন্তু তার সেই ছাতা দেখে গ্রামের মানুষরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

গ্রামে বীণার খাতির যত্ন বেড়ে যাবে। সবাই তাকে সমীহ করে চলবে। বন্ধুরাও শুনতে থাকবে তার

কথা। আর এদিকে দুষ্টু নন্দকিশোর হিংসায় জ্বলতে থাকবে। তার ঠিক ওই রকম একটা ছাতা চাই। কিন্তু পাবে কোথা থেকে? অজ পাড়াগাঁয়ে ছাতা বললেই কি আর ছাতা পাওয়া যায়? তাও আবার জাপানী ছাতা!

নন্দকিশোর বীণার কাছ থেকে ছাতাটা কিনতে চায়। কিন্তু বীণা দেবে কেনো? ছাতাটা যেন তার প্রাণ...তেপান্তরের মাঠ...রাজকন্যের জীয়ন কাঠি। বীণা ছাতা দেয় না,বরং ডাকাবুকো মেয়েটা বলে আসে খবরদার নন্দকিশোর তার ছাতার দিকে যেনো ফিরেও না তাকায়। কিন্তু তাই কি হয়? নন্দকিশোর তার দোকানের পুঁচকে বদমাশ ছেলেটাকে দিয়ে ছাতাটা চুরি করে। বীণা তন্নতন্ন করে খোঁজে,ছাতা পায় না। সে পুলিশ কাকুদের বলে নন্দকিশোরের ঘরে তল্লাশি চালায় কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। হঠাত একদিন সবাই দেখে নন্দকিশোর একটা লাল রঙের জাপানী ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরছে। গ্রামে তার প্রতিপত্তি আবার বাড়তে থাকলো আর সবাই বীণা আর তার বাড়ির লোকদের সাথে কথা বলা ছেড়ে দিলো। মনমরা হয়ে থাকলো বীণা। একদিন তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো সে পিছু নিলো নন্দকিশোরের। আর সেখান থেকেই জানতে পারলো নন্দকিশোর আসলে তার ছাতাটা চুরি করে রঙ করে ফেলেছে।

এদিকে গ্রামে খুব ঘটা করে কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতির আসন অলংকৃত করছেন নন্দকিশোর। তার তো অহংকারে আর মাটিতে পা পড়ছে না। এই রকম এক সময় হয়েছে কি বৃষ্টি নেমেছে। আর পাহাড়ের বৃষ্টি জানোই তো কেমন তেড়ে হয়। সেই বৃষ্টির পরোয়া না করেই নন্দকিশোর তার ছাতা নিয়ে খেলা দেখতে থাকলো আর ছাতার সব লাল রঙ গলে গলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকলো। লাল ছাতাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বীণার সেই নীল ছাতা হয়ে গেল। গ্রামবাসীরা সবাই ছি ছি করতে থাকলো। একটা ছোট্ট মেয়ের ছাতা চুরির অপরাধে নন্দকিশোরকে সবাই বয়কট করলো। কেউ তার দোকান থেকে কোনো জিনিস কেনে না...কথা বলে না...বিয়েতে, নানা অনুষ্ঠানে কেউ আর তাকে ডাকে না। এইভাবে সময় বয়ে চলে,গুটি গুটি পায়ে শীত চলে আসে... গাছের পাতা ঝরতে শুরু করে বরফে ঢেকে যায় গোটা গ্রাম...নন্দকিশোর একা।

এরকমই এক শীতের সকালে গ্রামের বাইরে নন্দকিশোরের দোকানের সামনে হঠাত একদিন কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। নন্দকিশোর তখন সেই সকালবেলা নিজের মনে বকবক করছিলো আর চা খাবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। খুট করে আওয়াজ শুনে নন্দকিশোর দেখে তার দোকানের সামনে বীণা দাঁড়িয়ে। তার হাতে নীল রঙের সেই ছাতা। বীণা একটা বিস্কুট কেনে। কতদিন পর নন্দকিশোরের দোকান থেকে কেউ কিছু কিনলো। বীণা চলে যাওয়ার পর নন্দকিশোর দেখলো তার দোকানের দরজার গায়ে হেলান দেওয়া সেই নীল রঙের ছাতা। বীণা ভুলে ফেলে গেছে। নন্দকিশোর সারাদিন ছাতাটাকে বুকে আগলে নিয়ে বসে থাকলো...কাঁদলো...রাতে ঘুমলো না...এক সময় রাগে ছাতাটাকে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলো কিন্তু পারলো না...সে যে বড় ভালোবাসে ছাতাটাকে। আবার সকাল হলো...আবার ঝিরঝিরে বরফের বৃষ্টির মধ্যে বীণাকে হাঁটতে দেখে নন্দকিশোর তাকে ডাকলো। ছাতাটা বীণার হাতে তুলে দিল। এবার কিন্তু অবাক করে দিয়ে বীণা ছাতাটা আর নিলো না। সে বললো এটা তার ছাতা নয়,নন্দকিশোর ইচ্ছে করলে নিতে পারে। ভেউভেউ করে কেঁদে ফেললো নন্দকিশোর কারণ সে ততদিনে জেনে গেছে চুরি করা, মিথ্যে কথা বলা অন্যায়...জীবনের বড় পাপ। ছোট্ট মেয়েটার কাছে সেদিন তার থেকেও বড় একটা মানুষ অনেক কিছু শিখলো।

আমিও সিনেমার হল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ফাঁকা লন দিয়ে হাঁটার সময় মনে মনে ভাবলাম বীণার ভূমিকায় অভিনয় করা শ্রেয়া শর্মার কথা। এইটুকু সময়ের মধ্যে সে আমাদের সবার মন জুড়ে বসে আছে। ভারতে পাহাড়ে ঘেরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত অসংখ্য গ্রামের ছোট্ট বীণাদের প্রতিনিধি আজ সে। রাস্কিন বন্ডের গল্পের অনুপ্রেরণায় এমন এক মিষ্টি ছবি উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজ।

কল্লোল লাহিড়ী
উত্তরপাড়া, হুগলী

ছবি
স্ন্যাশহিটস

বায়োস্কোপের বারোকথা: ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ

পর্ব চার

এবারে আমরা গল্প করবো ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ [১৮৭৫-১৯৪৮] কে নিয়ে। অনেকে বলেন তিনিই হলিউডের সেই বিখ্যাত গল্প বলা ছবির আবিষ্কর্তা। অনেকে তাঁকে বলেন ছায়াছবির জগতের শেক্সপিয়র। আসলে তাঁর হাত ধরেই নির্বাক সিনেমা প্রথম সত্যি সত্যি গল্প বলতে শিখল। তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছিল আধুনিক সিনেমার ব্যাকরণ। ভাবছো, সিনেমার আবার ব্যাকরণ হয় কি ভাবে? হয় বইকি! কোন ছবির পর কোন ছবি কিভাবে দেখালে দর্শক একটা ঘটনাকে সবথেকে ভাল বুঝতে পারবে, সেই নিয়মগুলি একসঙ্গে করেই তো তৈরি হল সিনেমার ব্যাকরণ। আর এই ব্যাকরণের অনেকটাই প্রথম তৈরি হয় গ্রিফিথের হাতে।

ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ

গ্রিফিথ কে নিয়ে আজও আমাদের মনে কৌতূহলের শেষ নেই। গল্প বলা ছবির স্রষ্টা হিসাবে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করি। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, তিনি ছিলেন ঘোরতর বর্ণবিদ্বেষী। তিনি

পৃথিবীর যেকোন সমস্যাকেই সাদা-কালো মানুষের দ্বন্দ্বের ভিতর দেখতেন। তাঁর সাদারা সবসময়ই ভাল, কালোরা সবসময়ই খারাপ। এর একটা কারন হয়ত এই যে, গ্রিফিথ বড় হয়ে উঠেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখানে সে সময়ে, আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে, এই ধরনের ভাবনা চিন্তা গুলি খুব গুরুত্ব পেত। এখোনো কিন্তু অনেকে সেই ভাবনার শিকার। তুমি কিন্তু খবরদার এই ভাবনা চিন্তাকে গুরুত্ব দিও না। মাথাতেও এনো না। আর কেউ ভাবলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা কোরো যে গায়ের রঙ দিয়ে সত্যি মানুষকে বিচার করা যায় না...করা উচিত নয়...আমরা কোনো দিন তা করবো না।

যাইহোক যে কথা বলছিলাম...গ্রিফিথ জন্মেছিলেন খুব সাধারণ এক পরিবারে, তাই বড় হয়ে তাঁকে নানাধরনের কাজ করতে হয়েছিল। এমনকি তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি লিখতেও পারবেন, কিন্ত তাঁর লেখকজীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সবথেকে মজার ব্যাপার হল যে সিনেমা বিষয়ে তাঁর তেমন কোন উতসাহ ছিলনা, বরং বেশ একটু নাক উঁচু মনোভাব ছিল। তিনি ছবিতে গল্প বেচে চটজলদি কিছু পয়সা আয় করতে চেয়েছিলেন। পোর্টার সাহেব, মানে এডউইন পোর্টার, যাঁর কথা আমরা আগের সংখ্যায় পড়েছি, গ্রিফিথের সুন্দর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দৈনিক পাঁচ ডলারের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নায়কের কাজ দেন। সে কাজ বেশিদিন থাকে নি। কিন্তু ভাগ্যের জোর...আর বলতে পারো খানিকটা নিজের ইচ্ছায় গ্রিফিথ একদিন পরিচালক হয়ে গেলেন। তিনি যে কোম্পানিতে কাজ করতেন তারা টাকার অভাবে নতুন পরিচালক জোগাড় করতে পারছিল না। ফলে গ্রিফিথ কে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল। তিনি তৈরি করলেন তাঁর প্রথম ছবি 'অ্যাডভেঞ্চারস অফ ডলি'।

এই ছবিটা তৈরি করার সময়েই কিভাবে ভাল গল্প বলবো এই কথা ভাবতে ভাবতে আবিষ্কার হয়ে গেল বিখ্যাত ১৮০ডিগ্রী ব্যবস্থা। ভাবছ সেটা আবার কি? নিচের ছবিটা দেখ।

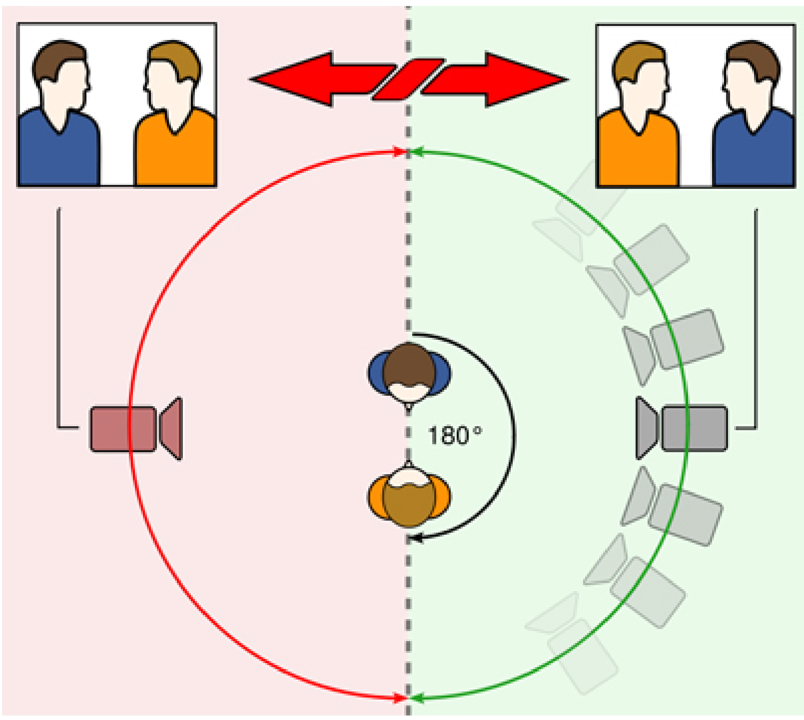

১৮০ ডিগ্রী ব্যবস্থা

একজন নীল জামা পরা লোক,আরেকজন কমলা জামা পর লোকের সঙ্গে কথা বলছে। যতক্ষণ তাদের মধ্যে কথা চলবে, ততক্ষণ ক্যামেরা ছবির ডান দিকের সবুজ লাইন বরাবর যেখানে ইচ্ছা বসানো যেতে পারে। এইভাবে সবসময়ই কমলা জামা পরা লোকটি বাঁ দিকে থাকবে আর নীল জামা থাকবে ডান দিকে। ক্যামেরা যদি উল্টোদিকে বসে, তাহলে তো নীল জামা চলে যাবে বাঁ দিকে আর কমলা জামা যাবে ডান দিকে!! এবার যদি ক্যামেরা একবার এদিকে, একবার ওদিকে বসানো হয়, তাহলে দর্শকের চোখে বড় বেশি ঝাঁকুনি লাগবে যে। কিন্তু ক্যামেরা যদি এই ১৮০ডিগ্রী ব্যবস্থা মেনে এক শট থেকে অন্য শটে যায়, তাহলে আমরা আর গল্পটা দেখতে দেখতে চমকে উঠব না। আমাদের মনে হবে আমরা সিনেমা নয়, যেন সত্যি ঘটনা দেখছি -চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দুইজন মানুষ কথা বললে যে অনুভূতি হয়, সেইরকম লাগবে।

এইভাবেই, আমরা দেখতে পাই যে, ১৯০৮-০৯ সাল নাগাদ, গ্রিফিথ ক্যামেরা থেকে বিষয়বস্তুর দূরত্ব অনুযায়ী নানারকম শট, যেমন ফুল শট বা ক্লোজ-আপ তৈরি করেছেন। ফুল শট মানে জানো তো? যখন একজন চরিত্রের মাথা থেকে পা অবধি পর্দায় দেখা যায়, তাকে বলে ফুল শট। আর যখন সেই চরিত্রের শুধুমাত্র মুখটাকে আমরা পর্দায় দেখতে পাই তখন তাকে বলা হয় ক্লোজ-আপ। বোঝানোর খাতিরে আমি এই সহজ উদাহরণ দিলাম। তাই বলে ভেবো না এটাই একমাত্র উদাহরণ। ক্লোজ-আপেরও নানা রকম ফের আছে আর ফুল শটেরও। সে না হয় অন্য কোনো দিন বলবো। কিন্তু এখন মনে হতেই পারে এই দুই রকম শটের দরকার কি? দরকার আছে, গল্প বলার খাতিরেই দরকার আছে। ফুল শট ব্যবহার করে একজন চরিত্রের অবস্থান বোঝানো যায়, যেমন, লোকটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে - রাস্তার ধারে, না বাগানে, সাথে কেউ আছে কিনা, আশেপাশে কে আছে; আর ক্লোজ-আপে দেখানো যায় সেই চরিত্রের মুখের ভাব - সে খুশি, না তার মন খারাপ।

গ্রিফিথের এইসব নিয়মগুলি দিয়েই শুরু হল হলিউডের এক নতুন যুগ...ছবির এক নতুন ভাষা। শুরু হল ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিকাল সিনেমার পথচলা। ধ্রুপদী কথাটার মানে হল যা কিনা চিরায়ত, এমন কিছু যা বহু বছর ধরে একইরকম ভাবে চলে আসছে, যার একটা নিজস্ব উতকর্ষ আছে যেটাকে মেনে চলা যেতে পারে। যেমন ধর, ভারতবর্ষের রাগপ্রধান সঙ্গীতের ধারা, যাকে বলা হয় ধ্রুপদী সঙ্গীত, যে গানের ধারা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। সেইরকমই হল সেই সময়ের সিনেমা তৈরির নিয়ম - সেই একশো বছর আগেও যা মেনে চলা হত, আর যা এখনও মোটামুটি ভাবে সবাই মেনে চলে।

গ্রিফিথের এই সমস্ত নিয়মগুলির কিন্তু দেশে-বিদেশে কদর বাড়তে থাকলো। এমন কি, সেই সময়ে আমেরিকার সঙ্গে যে দেশের মোটেও বন্ধুত্ব ছিল না, সেই সোভিয়েত রাশিয়াতেও তাঁর নিয়মগুলি নিজের ছাত্রদের শেখাতেন আরেক বিখ্যাত পরিচালক লেভ কুলেশভ।

গ্রিফিথের আরেকটি অবদান হল যে তখনও পর্যন্ত যে টু-রিলার [দুই রিলের] ছোট ছবি বানানো হত, সেই রেওয়াজ তিনি ভেঙ্গে ফেললেন, এবং ১৯১৪ সালে তৈরি করলেন বিখ্যাত ছবি 'বার্থ অফ আ নেশন'। অনেকেই এই ছবিকে পৃথিবীর প্রথম পূর্ন দৈর্ঘ্যের আখ্যানচিত্র, বা গল্প বলা ছবি বলে মান্য করে থাকেন। এই ছবির নির্মাণে খরচ হয়েছিল সেই যুগের এক লক্ষ দশ হাজার ডলার। এই ছবিতে আছে ১৫৪৪ টি শট, সেযুগের পক্ষে যা অতিরিক্ত বেশি। সেগুলিকে নানারকম ভাবে মাত্র তিন মাসের মধ্যে জুড়ে জুড়ে, গ্রিফিথ তৈরি করেছিলেন এক অসাধারণ সিনেমা এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে বিরতি না নিয়ে একটি গল্প বলতে পারা যায় এবং দর্শককে প্রায় বই পড়ার অনুভূতি দেওয়া যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, আজও গল্প বলা সিনেমা যেসব উপায়ে জমজমাট গল্প বলে, তার মধ্যে প্রায় সবকটিই প্রথম ব্যবহার হয়েছিল 'বার্থ অফ আ নেশন' ছবিতে। এর ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি আমরা অনেকেই ভাবি ছবি দেখা তো একটা সহজ ব্যাপার। এই তো যা দেখছি...যেমন ভাবে দেখছি সেটাই তো একটা ছবি। এর জন্য আলাদা করে ভাবার...পড়াশুনো করার কি কোনো দরকার আছে? অনেকে বলেছিলেন নেই অনেকে বলেছিলেন আছে কেউ কেউ ছবি দেখা...বানানোর পাশাপাশি লেখালেখিও শুরু করেছিলেন। আর সেটা শুরু হয়েছিলো ছবি জন্মানোর প্রায় সেই সময় থেকেই। ওদিকে এখন যাবো না কারণ সে তো আর এক ইতিহাসের গল্প। বরং আমরা 'বার্থ অফ আ নেশনের' দিকে মনোযোগ দিই।

এই ছবিটি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বিষয়ে গল্প বলে। আগেই বলেছি, গ্রিফিথ ছিলেন আদতে বর্নবিদ্বেষী। তাঁর এই ছবিটিও এইরকম ভাবনা চিন্তায় ভরা। 'বার্থ অফ আ নেশন' একদিকে যেমন প্রচুর জনপ্রিয় হয়, প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উডরো উইলসন একে বলেন 'আলোয় লেখা ইতিহাস'; অন্যদিকে, জাতিবিদ্বেষের জন্য এই ছবিটিকে প্রচুর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়।

হয়ত সমালোচনার ফলেই, দুইবছর পরে তৈরি 'ইনটলারেন্স' [১৯১৬] ছবিতে গ্রিফিথ অনেক বেশি উদারতার পরিচয় দেন। এই ছবিটি আজও অবধি হলিউডের এক অন্যতম জমজমাট ছবি। এই ছবিতে গ্রিফিথ, তাঁর অন্যান্য নিয়মগুলির সাথে, প্রথম ব্যবহার করেন 'মন্তাজ' নীতি। যে নীতিতে কয়েকটি ছবি পরপর বসিয়ে একটি ঘটনা বা অবস্থা বোঝানো যায়।

বলা যেতে পারে, ডেভিড ওয়র্ক গ্রিফিথই প্রথম প্রমান করেন যে আধুনিক শিল্প হিসাবে সিনেমা কতটা সম্ভাবনাময়। আবার বলি তাঁর হাত ধরেই আমাদের সামনে আসে সিনেমায় গল্প বলার কতগুলি দুর্দান্ত নিয়ম, যা আজও ব্যবহার হচ্ছে। এরপর থেকেই সিনেমার চেহারা আমূল পালটে গেল, শুধু আমেরিকাতেই নয়,সারা পৃথিবীতেই। ছবি আর তার ভাষা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে সবাই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে লাগলেন। শুরু হল শিল্পের আর এক নয়া মাধ্যম চলচ্চিত্রের জয়যাত্রা। সেই গল্প আমরা পরের বার বলবো। সেই গল্প শুরু হবে বিখ্যাত নির্বাক মার্কিনী হাসির ছবিগুলি নিয়ে- চ্যাপলিন, কীটন, লয়েড, সেনেট - এইসব মজাদার মানুষদের নিয়ে।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি
উইকিপিডিয়া

পরশমণি: রান্না ঘরে গোলমাল

চলো আবার যাই রান্না ঘরে। দেখি সুলুক সন্ধান করে কিছু পাওয়া যায় কিনা। তোমাকে তো যেতেই হচ্ছে। মা ডাকছেন দুধ খেতে।

আরে ওকি? মা 'গেলো গেলো' বলে চিতকার করছেন কেনো? চলতো দেখি। ও, দুধ উথলে পড়ে গেছে আর তাতে গ্যাসও নিভে গেছে।এর পর মা যেটা করলেন সেটা বড়ই গোলমেলে একটা কাজ। গরম দুধটা তাড়াতাড়িতে একটা কাচের গ্লাসে ঢেলে ফেললেন। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে চড়াত করে একটা শব্দ,গ্লাস ফেটে চৌচির।

কি গেরোরে বাবা!!

তবে এর পর মা যেটা করলেন সেটা কিন্তু একদম সঠিক কাজ। অন্য একটা গ্লাসে দুধ ঢালার আগে একটা চামচ রাখলেন তাতে। এবার কিন্তু গরম দুধ ঢাললেও গ্লাসটা ফাটলো না। তিন তিনটা কান্ড হল পর পর। কি মনে হচ্ছে, কি কারন থাকতে পারে এর পেছনে? দেখা যাক এক এক করে।

দুধটা উথলে উঠে পড়ে গেল কেনো?অথচ জল টগবগ করে ফোটালেও উথলে ওঠেনা বা পড়ে যায় না। দুধ আর জল ফোটে এক রকম করেই, তবে সামান্য একটু তফাত আছে এক জায়গায়। দুধে ফ্যাট বা 'স্নেহপদার্থ' আছে, জলে নেই। দুধ যখন গরম করা হয় তখন নিচের অংশ গরম হলেও ওপরের স্তরটা কিন্তু তুলনায় কিছুটা ঠান্ডা থাকে। আর যার জন্য ওপরের ফ্যাটটা জমে গিয়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত একটা সর পড়ে। সরটা দুধটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে। তুমি কি সর খেতে ভালোবাসো? আমি তো খুব ভালোবাসি। কি বললে? একদম পছন্দ নয়? তাহলে আর কি করা যাবে...একবার খেয়ে দেখতে পারো চিনি দিয়ে।

যাকগে, যা বলছিলাম - নীচে দুধের বুদ বুদ গুলি ওপরের দিকে উঠে বেরিয়ে যেতে চায় কিন্তু সরের ঢাকনাতে আটকা পড়ে যায়। তখন সবগুলো বুদ বুদ মিলে একত্রে নিচ থেকে ঠেলা মারে। সরটা ঠেলা খেয়ে ক্রমশঃ ওপরের দিকে ওঠে আর দুধ শেষ পর্যন্ত পাত্রের কানা উপচে বাইরে পড়ে যায়।

একটা চামচ দিয়ে যদি ওপরের সরটা ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু দুধটা পড়বে না। সেই জন্যই গরম করার সময় চামচ দিয়ে দুধকে অনবরত নাড়া হয়।

তা তো হলো। কিন্তু কাচের গ্লাসটা ফাটলো কেন বলতো?

তোমরা কি জান যে সব জিনিষকেই গরম করলে লম্বায় চওড়ায় আয়তনে বেড়ে যায়? কাচের গ্লাসে গরম দুধ বা জল ঢাললে তার ভেতরের তলটা আয়তনে বেড়ে যায়। অথচ কাচ ভেদ করে তাপ গ্লাসের বাইরের স্তর পর্যন্ত দ্রুত পৌছতে পারে না। কাচ তাপের কুপরিবাহি কিনা। তাই বাইরের দিকটা বাড়তে পারে না। ভেতরটা বাড়লো অথচ বাইরেটা যেমনকার তেমনি রয়ে গেলো। সে জন্য দুই স্তরে কাচের প্রসারনের তফাতের কারনে চাপের তারতম্য হলো। আর সেটা হতেই কাচের গ্লাসে চড়াত করে চিড় ধরে গেলো!

মা একটা চামচ গ্লাসের মধ্যে দিয়ে যে কাজটা করলেন সেটা একেবারে সঠিক। এতে কি হল বলতো? ধাতব চামচ তাপের সুপরিবাহী হওয়ায় গরম দুধের তাপটা তাড়াতাড়ি শুষে নিলো। আর তার কিছুটা বাইরে পাঠিয়ে দিলো। ফলে দুধের তাপ যতটা থাকলে কাচের গ্লাস ফেটে যেত ততটা আর থাকছে না। তাই গ্লাসটাও আর ফাটল না।

কুপরিবাহি কথাটার মানেটা কি জান? একটু বুঝিয়ে বলি। যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ চলাচল করতে পারে না সেগুলি কুপরিবাহি। যেমন,কাচ কাঠ কাগজ - এই সব আর কি। আর যারা তাপকে বহন করে বা বয়ে এক জায়গা থেকে আর এক যায়গায় নিয়ে যেতে পারে তারা হল সুপরিবাহি। যেমন, কোন ধাতব পদার্থ। স্টিলের চামচ একটা ধাতব পদার্থ। এটা তাপকে সহজেই অন্যত্র চালান করে দিতে পারে।

চাপের তারতম্য কথাটার মানেটাও তো বলে দিলে ভালো হয়,তাই না?কাচের গ্লাসের ভেতরটা বেড়ে গিয়ে বড় হতে চাইছে অথচ বাইরেটা যেমনকার তেমনি রইল। একটা টানা- পোড়েনের মতো ব্যাপার হল না? এটাই চাপের তারতম্য।

মোটা কাচের গ্লাসগুলোই সাধারনত ফেটে যায়। কেননা গ্লাসের দেওয়াল পাতলা হলে কাচ কুপরিবাহী হলেও ভেতরের তাপ একটু তাড়াতাড়ি বাইরে যেতে পারে। ফলে প্রসারনটা মোটামুটি সমান হয়। গ্লাসও ফাটে না।

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

জানা-অজানা

বৈঠকী রবি ঠাকুর

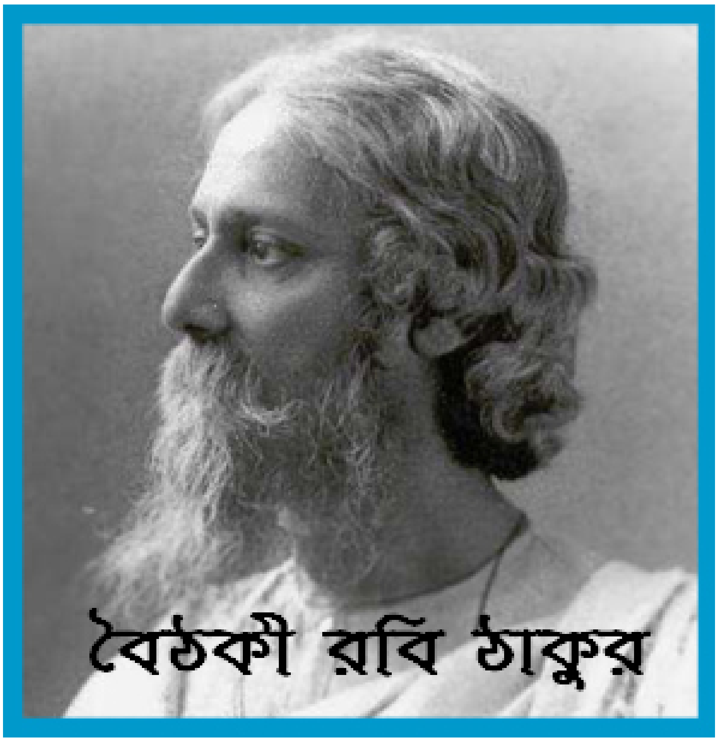

রবি ঠাকুর, মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চেন তো? তুমি তো ঘাড় নেড়ে বলবে -হ্যাঁ। কিন্তু সত্যি কি পুরোপুরি চেনো? তাঁর গান, কবিতা, নাটক, নোবেল প্রাইজ, জোড়াসাঁকো, শান্তিনিকেতন এইসব গল্প তো সকলের জানা। আমি বরং তোমায় কিছু বৈঠকী গল্প শোনাই, যা হয়ত তোমার অজানা।

১

একদিন রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে একদল ছেলে এসেছে পুজোর চাঁদা নিতে। তিনি তাদের বসতে বললেন। তারপর বাড়ির কাজের লোককে ডেকে বললেন "যা তো এনাদের জন্য চা নিয়ে আয়"। ওনাদের দলের একজন বললেন-"না, না, আমরা চা খাই না"। সঙ্গে সঙ্গে কবি বললেন, "ওঃ এঁরা নাচার দলে"; ওনারা ভারি অপ্রস্তুত। ওনাদের আরেকজন বললেন,"We mean, we don't take tea." কবি সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন "ওরে ভুল বলেছি ওনারা [no tea] নটীর দলে..."

২

আরেকদিন কবির বৈঠকখানায় একঘর লোক বসে আছে। কবি হটাৎ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন " এ ঘরে একটা বাঁদর আছে।" সক্কলে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে শুরু করল। কবি কাকে

বাঁদর বলছেন রে বাবা! দম বন্ধ করা কয়েক মূহূর্ত! হটাৎ কবি হেসে উঠলেন হা হা করে। বললেন, "ওরে বাবা, এ ঘরে যেমন একটা ডান দোর [দরজা] আছে, তেমন এই দিকে একটা বাঁ দোর ও আছে!"

৩

রবি ঠাকুর নীল রঙের বড় ভক্ত ছিলেন। বলতেন "সব রঙের মধ্যে নীল রংটাই আমার মনকে বেশি করে নাড়া দেয়। কারণ নীল রংটা যে পৃথিবীর রঙ, আকাশের শান্তির রঙ, ওটার মধ্যে আমার চোখ ডুবে যায়। লাল রংটা হল, রক্তের রঙ, আগুনের রঙ, প্রলয়ের রঙ, মৃত্যুর রঙ, কাজেই বেশি দেখতে না পেলে দোষ কি?"

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল উনি রঙ কানা ছিলেন!

৪

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর কবি শুয়ে আছেন তাঁর ঘরে, ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে। সেই ঘরেই এক কোনায় বসে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী ও নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী পানের বাটা নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পান সাজছিলেন আর খাচ্ছিলেন; আর কোনও এক গল্পের ছলে হাসিতে লুটিয়ে পড়ছিলেন। কবি তক্ষুনি কাগজ কলম নিয়ে বসলেন, লিখলেন -

"ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই,
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোনে বসে কানাকানি
কভু হেসে কভু কেঁদে নীরব হয়ে রই..."

এইরকম আরো নানা সরস গল্প আছে রবি ঠাকুরের বিষয়ে। আবার অন্য কোন বারে, বলব, কেমন? এই গল্পগুলি কেমন লাগল আমায় চিঠি লিখে জানিও কিন্তু।

কোয়েলী গঙ্গোপাধ্যায়
ফরতাবাদ, কলকাতা

নাকাই আর পিপিলীকাভূক

একটা ছোট্ট ছেলে, নাম তার –নাকাই। বয়স কত বলো তো – মাত্র বারো বছর বয়স। উত্তর জিম্বাবোয়ের মুরেওয়া শহরের কাছে সে তার মা, বাবা, আর ছোট ছোট ভাইবোনদের সাথে থাকে একটা চালাঘরে। খুব গরীব তো তাই ছাগল চড়ায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। সময় পেলে বই পড়ে নয়তো ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। একদিন কি হয়েছে জানো?

এমনি ছাগল চড়াতে চড়াতে একদিন সে একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখতে পেল। সে কিন্তু ভয় পায় নি, ভাবলো মনে মনে ওটা বোধহয় একটা সজারু- ওই যার সারা গায়ে কাঁটা কাঁটা থাকে।

নাকাই যে জন্তুটাকে দেখল তার গায়ে কিন্তু কাঁটা নেই আবার কোন পড়ার বইতেও সে এরকম জন্তুর ছবি দেখে নি। ওকে দেখে জন্তুটা এক নিমেষে বড় বড় ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

দৌড়ে দৌড়ে বাড়িতে গেল নাকাই আর গ্রামের সব মানুষকে, চিতকার করে ডাকতে লাগলো, "শিগগির এসো, আমি একটা অদ্ভুত জন্তু দেখেছি। তোমরা কেউ কোনোদিন এরকম জন্তু দেখোনি। আমার বইতেও এরকম কোন জন্তুর ছবি নেই।"

নাকাই এর মুখে জন্তুটার বর্ণনা শুনে, গ্রামের যারা বয়স্ক মানুষ, তাঁরা বুঝতে পারলেন নাকাই একটা প্যাঙ্গোলিন দেখতে পেয়েছে।

সবাই ছুটে ছুটে এল আর অর মা বাবাও এল। কিন্তূ কেউই কিছু দেখতে পেল না। সবাই ভাবলো নাকাই বোধহয় ওদের সাথে দুষ্টুমি করছে!

সবাই খুঁজতে আরম্ভ করলো। কেউ বা গাছে চড়ে বসলো, কেউ বা বড় বড় ঘাসের মধ্যেই খুঁজতে থাকলো। শেষে একদিক থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শুনে সবাই সেইদিকে দৌড়ালো। সবার আগে গিয়ে পৌঁছালো মানোকা নামে একজন ওদের গ্রামেরই মানুষ। মানোকা দেখলো, একটা অদ্ভুত জন্তু একটা গর্তের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। জন্তুটার দাঁত নেই, দেখতে যেনো খানিকটা ডায়নোসরের মত। সারা গায়ে একটা বাদামী রঙের মাছের আঁশের মত আঁশ ঢাকা খোলস। মুখটা ছুঁচালো ও সরু

আর ল্যাজটা বড়।

প্যাঙ্গোলিন

মানোকা ধীরে ধীরে ল্যাজ ধরে জন্তুটাকে টেনে বার করলো। ততক্ষনে তো গ্রামের আর সবাই সেখানে পৌঁছে গেছে। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই চলে এলেন দুইজন গেম ওয়ার্ডেন [game warden]। গেম ওয়ার্ডেনদের কাজ হল শিকার এবং শিকারের পশু-পাখিদের ওপর নজরদারি রাখা।

গেম ওয়ার্ডেনরা কেনো এলেন বলতো? আসলে প্যাঙ্গোলিন হল একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রানী বা endangered species। অর্থাৎ কিনা, এই প্রানীর সংখ্যা পৃথিবীতে ক্রমশঃ কমে আসছে। তাই প্যাঙ্গোলিন কে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে বিভিন্ন দেশের সরকার। যে প্যাঙ্গোলিনটিকে খুঁজে পাওয়া গেলো, সেটিকে যাতে ঠিকমত যত্ন করা হয়, তার তদারক করতেই এলেন ওই দুইজন গেম ওয়ার্ডেন।

প্যাঙ্গোলিন সাধারনতঃ পাওয়া যায় দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার কিছু অংশে। এই নিরীহ স্তন্যপায়ী প্রানীগুলি কি খায় জানো? এদের প্রধান খাবার হল পিঁপড়ে, উইপোকা এইসব। প্যাঙ্গোলিনের দাঁত নেই, কিন্তু আছে একটা লম্বা আঠালো জিভ - সেইটা একবার পিঁপড়ের বাসায় ঢুকিয়ে দিলেই হল! সেই আঠালো জিভে লেগে যায় রাশে রাশে পিঁপড়ে। এতটা পড়ার পর তুমি প্যাঙ্গোলিনের বাংলা নাম নিশ্চয় মনে করে ফেলেছো? - একদম ঠিক- পিপীলিকাভূক!! প্যাঙ্গোলিন মাটির তলায় গর্ত করে এতোটাই বড় বাসা বানায় যে তার ভেতরে একটা বড় মানুষ ঢুকে দাঁড়িয়ে যেতে পারে!! শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই লাজুক প্রানী তার পেট আর মুখ গোল করে গুটিয়ে পিঠের শক্ত আঁশের ভেতর নিয়ে নেয়। প্যাঙ্গোলিনের পিঠের আঁশগুলি তাকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। যদি দুট আঁশের ফাঁকে তোমার আঙ্গুল ঢুকে যায়, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে আঁশ দিয়ে চেপে ধরবে, আর জোরে চিমটি কাটার মত ব্যথা লাগবে কিন্তু! পৃথিবিতে আট রকমের প্যাঙ্গোলিন প্রজাতি আছে, যার মধ্যে বেশিরভাগ গুলোই কিন্তু লুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন অস্তিত্ব। মালয় শব্দ 'পেঙ্গুলিং' - মানে' যা গুটিয়ে যায়' - থেকেই প্যাঙ্গোলিন [pangolin] নামটা এসেছে।

প্যাঙ্গোলিনের ছানা

কিন্তু প্যাঙ্গোলিন লুপ্তপ্রায় প্রজাতি হল কেনো? - কারন কিছু মানুষ, না ভেবে শুনে এর চমকদার চামড়া আর মাংসের জন্য এই নিরীহ প্রানীগুলিকে যথেচ্ছ মেরে ফেলেছে। অনেক দেশে আবার মনে করা হয় প্যাঙ্গোলিনের দেহের কিছু অংশ অনেক অসুখ সারাতে পারে। সেইজন্যেও প্রচুর শিকার করা হয়েছে। এইভাবে ক্রমশঃ এই প্রানীর সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে বসেছে।

নাকাই এর দেশ জিম্বাবোয়ের সরকার ঘোষনা করেছিলেন যে কেউ যদি প্যাঙ্গোলিন দেখতে পায় আর সেটাকে সরকারের হাতে তুলে দেয়, তাহলে তাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হবে, এমনকি টেলিভিশনে তার ছবিও দেখানো হবে। আর সেই উদ্ধার করা প্যাঙ্গোলিনকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কোন অভয়ারন্যে- যেখানে সে শান্তিতে, নির্ভয়ে থাকতে পারবে। নাকাই এর এই প্যাঙ্গোলিন উদ্ধারের ঘটনার কথা ২০০৭ সালে লেখেন সিসিল ডেওওয়া। তিনি লেখেন, সে সময়ে নাকাই এর গ্রামের এক বৃদ্ধ মানুষ বলেছিলেন "আমার ভাগ্য ভাল আমি সত্তর বছর পরে এই জন্তুটাকে আবার দেখতে পেলাম!" এটা শুনেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ জিম্বাবোয়েতে প্যাঙ্গোলিনের সংখ্যা কত কমে গেছে।

সবাই ভাবতে বসলো- কে পাবে সম্মান- নাকাই না মানোকা? শেষমেষ মানোকা বললো - নাকাই সবথেকে আগে প্যাঙ্গোলিনটাকে দেখতে পেয়েছে, তাই সম্মান ওরই প্রাপ্য।

মায়ের পিঠে চেপে বেড়াতে যাচ্ছে ছানা প্যাঙ্গোলিন

জিম্বাবোয়েতে মনে করা হয়, প্যাঙ্গোলিন দেখতে পেলে ভাগ্য খুলে যায়। নাকাই আর অন্যান্য গ্রামবাসীদের ভাগ্য তো ভাল হবে নিশ্চয়, কিন্তু বড় কথা হল এই প্যাঙ্গোলিনটার ভাগ্যটাও ভালো- যে ওকে সবাই মিলে রক্ষা করলো, তাই না? তুমি কি জানো- এইরকম আরো অনেক প্রানী আছে সারা পৃথিবী জুড়ে, যাদের অনেকেরই অস্তিত্ব বিপন্ন, শুধুমাত্র মানুষের ভাবনা চিন্তাহীন কাজকর্মের জন্য? আমাদের দেশের অলিভ রিডলী কচ্ছপ, বনবিড়াল, শেয়াল, চীনের প্যান্ডা, সাইবেরিয়ার তুষার ভালুক...এমন আরো অনেক প্রজাতি কিন্তু ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। এদের সবাইকে আমরা যদি সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তবেই তো পৃথিবী আরো সুন্দর হয়ে উঠবে, কি বলো?

সীমা ব্যানার্জী
ড্যালাস, টেক্সাস
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছবি
সেভপ্যাঙ্গোলিনস
সিবিসি
মডার্নাইজডকেভম্যান

কমিকস্ কাহিনী: দুই বেড়ালের গপ্পো

তুমি কি গারফিল্ডকে চেনো? কিম্বা হিথক্লিফকে? ধরে নিলাম চেনো। হয়তো ভালোও বাসো মনে মনে। আমিও খুব ভালোবাসি ওদের। ওদের সব কিছু দৌরাত্মি ধরা পড়ে কমিকসে। আর সেইসব কান্ড আমরা সবাই খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করি টক-মিষ্টি আচার খাবার মতো করে। তাই না? জানো তো গারফিল্ডের নাম গিনেস বুকেও পাওয়া যায়। পৃথিবীর হেন কাগজ নেই যেখানে নাকি গারফিল্ডকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুনে তো নিশ্চই গারফিল্ডের ল্যাজ মোটা হচ্ছে। তা একটু হোক...ওয়ার্ল্ডে পপুলার বলে কথা। খবরের কাগজে জনপ্রিয়তা লাভের পর গারফিল্ডকে আমরা দেখতে পেলাম টেলিভশনের পর্দায়। সেই সিরিজও তো খুব জনপ্রিয়তা পেলো। ভাবছো হিথক্লিফকে নিয়ে বলছি না কেনো? আরে বাপু দাঁড়াও...একটু সবুর করো দেখি। বলবো তো তার কথাও। দেখছো না গারফিল্ড কেমন মিটমিট করে তাকিয়ে আছে। আগে তার আবদার মেটাই।

গারফিল্ড

১৯৭৮ সালের ১৯ জুন লেখক জিম ডেভিসের পায়ে পায়ে গারফিল্ডের পথ চলা শুরু। আলসেমিতে ভরা পেটুক গারফিল্ডের দিনযাপনের সেই চিত্র তখনই সবার মনে আলোড়ন তুলতে শুরু করেছিলো। গারফিল্ড হলো জন আরবাকলের পোষা বেড়াল। জনের হাতে তেমন কোনো কাজ নেই, হয় সে গারফিল্ডের সাথে সারাদিন বকবক করে নয়তো মোজা কেনে আর এইসবেও যখন তার মন ভরে না তখন সে নিজের পায়ের নখ কাটে। এখন আমার মতো তোমার মনেও প্রশ্ন জাগতে পারে যে জিম

ডেভিস হঠাত কেন গারফিল্ডের মতো বেড়ালের চরিত্র আঁকলেন তাঁর কমিকস স্ট্রিপে? কোনো চিন্তা-ভাবনা কি কাজ করেছিলো এর পিছনে?

গারফিল্ডের আগে জিম পোকামাকড়দের নিয়ে কমিক স্ট্রিপ আঁকতেন এবং লিখতেন। কিন্তু সেই কমিকস খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি আর তেমন প্রশংসাও পায়নি। মনে মনে একটু কষ্ট পাচ্ছিলেন জিম। তখন একদিন এক সম্পাদকের সাথে দেখা হল জিমের তিনি তাঁকে বললেন, "জিম, তুমি আঁকতে ভালোই পারো...গল্পটাও ভালোই বলো...এবার তোমার এমন কিছু নিয়ে কাজ করা উচিত যা পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারবে।" সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী সৃষ্টি হলো গারফিল্ডের জীবন বৃত্তান্ত। সবচেয়ে মজার তথ্য হল এই যে গারফিল্ডের নাম থেকে শুরু করে তার চরিত্রের খুঁটিনাটি জিম তৈরী করলেন তাঁর দাদু এ গারফিল্ড ডেভিসের অনুকরণে। আসলে জিমের দাদু বড়ই বদমেজাজি আর অলস। শুরুর দিকে গল্প গুলোতে লেম্যান বলে একটি চরিত্রকে দেখতে পাওয়া যেতো। কারণ ডেভিস ভেবেছিলেন আরবাকলের তো একটা কথা বলার লোকের দরকার। কিন্তু পরে তিনি ভেবে দেখলেন এর জন্য গারফিল্ডই যথেষ্ট। আর সেই থেকে গল্পে একটা নতুন মাত্রা যোগ হয়। মানুষ আর বেড়ালের কথোপকথন আর তার সাথে নানান মজার কান্ড কারখানা। গল্প থেকে লেম্যান চলে গেলেও আরবাকলের বাড়িতে থেকে যায় তার পোষা কুকুর ওডি। গারফিল্ড আবার মাঝে মাঝে টিভি দেখে। শুধু তাই নয় জন যা খাবার আনে গারফিল্ড সব খেয়ে ফেলে। সে এমন লোভী আর পেটুক বেড়াল যাকে ইঁদুরেরা পর্যন্ত খাবারের লোভ দেখিয়ে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায়। গারফিল্ডকে সারাদিন ঘুমোতে দেখে জন নিজের মোবাইল চার্জার দিয়ে তাকে চার্জ করতে চায়!! কিন্তু তাতেও কিছু হয় না পেটুক আলসেমিতে ভরা গারফিল্ডের। সে শুয়েই চোখ মিট মিট করে। দেখো এখানেও কেমন মিটমিট করে তাকিয়ে আছে। কুঁড়ের বাদশা নামে আজও গারফিল্ড জগত বিখ্যাত।

ওরে বাবা ওদিকে তো আবার হিথক্লিফ ডাকতে শুরু করেছে বেজায়। চলো তো দেখি কি বলছে? আচ্ছা বুঝেছি তার গোঁসা হয়েছে। বলছি বাবা...বলছি তোমার কথা। ইচ্ছামতীর বন্ধু একটু মন দিয়ে শোনো হিথক্লিফের কথা। কারণ না শুনলে যা পাড়া বেড়ানো স্বভাব তার, কোনদিন তোমার বাড়ি চলে যাবে।

হিথক্লিফ

হিথক্লিফকে গারফিল্ডের দাদা বলতে পারো। কারণ হিথক্লিফ গারফিল্ডের থেকে পাঁচ বছরের বড়। আসল কথাটা হলো জর্জ গেটলি হিথক্লিফের গল্প শুরু করেন ১৯৭৩ সালে। জর্জ গেটলি ছোটবেলা থেকেই দেখতেন তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে আছে নানান কমিকসের বই আর চরিত্রেরা। আর থাকবে নাই বা কেনো তাঁর বাবা আর দাদা তো এই সব নিয়েই চর্চা করতেন। জর্জের দাদা জন একজন নাম করা কার্টুনিস্ট। দাদা এবং বাবার দেখাদেখি জর্জেরও ঝোঁক গেলো আঁকাআঁকির দিকে। ক্যুইনস ভিলেজ ছেড়ে চলে এলেন নিউইয়র্ক শহরে। ভর্তি হলেন বিখ্যাত কলেজ প্র্যাট ইন্সটিটিউটে। পাশ করার পর এক বিজ্ঞাপনের অফিসে কাজ করতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুতেই জর্জের মন বসছিলো না। ইচ্ছে হতো দাদার মতো কাজ করতে। ১৯৫৭ সালে জর্জের প্রথম কমিকস বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু তুমি মনে মনে হয়তো ভাবছো এই এতো সবের মধ্যে বেড়াল কই? আরে আছে, হিথক্লিফকে দেখতে প্রায় গারফিল্ডের মতো। কিন্তু দেখতে এক হলে হবে কি দুজনের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আগেই বলেছি গারফিল্ডের মতো অলস বেড়াল আর দুটি নেই। আর হিথক্লিফ? সে হলো পাড়া বেড়ানো...মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি ভরা এক বেড়াল। পাড়ার কুকুররাও তার ভয়ে তটস্থ। মাছওয়ালা কিম্বা দুধওয়ালার দুরবস্থার কথা না বলাই ভালো।

হিথক্লিফ বাড়ির পোষা বেড়াল। সেই বাড়ির দিদিমা তাকে খুব ভালোবাসে। আর এই হিথক্লিফকে নিয়ে টেলিভিশন সিরিজ শুরু হয় ১৯৮০ সালে। মনে রাখার মতো কথা হলো যে কমিক স্ট্রিপে হিথক্লিফ কোনো কথা বলতো না। টেলিভিশনের পর্দায় সে কিন্তু কথা বললো। বিখ্যাত কমেডিয়ান অভিনেতা মেল ব্লাঁ [Mel Blanc] হিথক্লিফের কন্ঠে অভিনয় করতেন। ১৯৮৪ সালে আবার শুরু হয় হিথক্লিফের টেলিভিশন সিরিজ। এই সময় থেকে হিথক্লিফের গল্পের সাথে জুড়ে দেওয়া হয় ক্যাটিল্যাক ক্যাটস [Catillac Cats] নামের এক মজাদার সিরিজ। এই সিরিজে দেখতে পাওয়া যায় নানা রকমের বেড়ালদের যারা সাধারণত পাড়া চষে বেড়ায়। এরা সবাই থাকে হিথক্লিফের পাড়াতে। রিফ-র‍্যাফ হলো দলের নেতা বেড়াল। ক্লিও এক সুন্দরী বেড়াল আর রিফ-র‍্যাফএর বান্ধবী।

এতো গেলো কমিক স্ট্রিপের বেড়ালদের গল্প। তোমার বাড়িতে বেড়াল আছে নাকি? কিম্বা তোমার বন্ধুর বাড়িতে? নিশ্চই তাদের অনেক মজার গল্প আছে। সব লিখে পাঠাও ইচ্ছামতীকে...আর ও হ্যাঁ বলতে তো ভুলেই যাচ্ছি ছবি পাঠিও তার সঙ্গে। মনে থাকবে তো? আমার এক বন্ধুর বাড়িতে পনেরোটা বেড়াল আর দু-তিনটে কুকুর আছে। বুঝতেই পারছো কেমন সব রকমারি গল্প। সে সব না হয় অন্য কোনোদিন বলবো। ভালো থেকো তুমি।

লেখা ও ছবি
পূর্বাশা
নিউ আলিপুর, কলকাতা

এক্কা-দোক্কা: তীর ধনুক

তুমি কি কখোনো তীর ধনুক দেখেছো? দেখেছো নিশ্চয়। হয়তো প্লাস্টিকের তৈরি একটা ছোট্ট নমুনা নিয়ে খেলাও করেছ। কিন্তু সত্যিকারের তীর ধনুক হাতে নিয়েছো? ছুঁড়েছো তীর? কোনো এক অলস দুপুরে সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে...এক পাড়া গাঁয়ের ছেলে হাতে তীর ধনুক নিয়ে নিজেকে বীর কর্ণ মনে করছে। আর কিছু দিন আগে দেখা এক যাত্রার সংলাপ বলে চলে চলেছে। মহাভারতের কর্ণকে কি তুমি চেনো? সে এক বীর নায়ক। সূর্য আর কুন্তীর পুত্র। কিন্তু সে যদি থাকে তাহলে মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পান্ডবরা জিতবে কি করে? অতএব মরতে হবে কর্ণকে। প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় বীর কর্ণ মারা যাচ্ছেন। গ্রামের যাত্রায় এই গল্প দেখার পর ছোট্ট অপু কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না কর্নের মৃত্যু। একলা একলা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করে যাচ্ছে কর্ণকে জেতাবার। কিন্তু পারছে না...তীর ধনুকের গল্প করবো আর কর্ণের কথা, অপুর কথা বলবো না সেটা হয়না। অপুর এই তীর ধনুক খেলার গল্প জানতে হলে পড়ে ফেলো 'পথের পাঁচালী' বা অন্তত তার সংক্ষিপ্ত সংস্করন

-'আম আঁটির ভেঁপু'। কিন্তু আমি আপাতত করবো তীর ধনুকের গল্প।

তুমি নিশ্চই আমার সাথে একমত হবে যে পৃথিবীতে মানুষই হলো শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব সে পেয়েছে অন্য সব বিশাল আকার বলশালী প্রাণীদের হঠিয়ে অথবা হারিয়ে দিয়ে। অন্য প্রাণিদের চেয়ে দুর্বল মানুষ নিজেকে বাঁচাতে তুলে নিয়েছিলো ভারী ভারী পাথরের টুকরো। সেই পাথরের টুকরো ছুঁড়ে তাকে বাঁচতে হয়েছে সেই বিশালাকার প্রাণিদের হাত থেকে। এই বাঁচার তাগিদেই মানুষ আবিষ্কার করেছিলো তীর ধনুক। হয়তো কোনো বেঁকে যাওয়া গাছের ডালে নিজেদেরই শিকার করা প্রাণীর অন্ত্র দিয়ে তৈরী ছিলা, আর ভেঙে যাওয়া বর্শার সামনের অংশটুকু দিয়ে কোনো একজনের আবিষ্কৃত তীর ধনুক মানুষ ব্যবহার করতে শিখলো...সেদিন থেকেই মানুষ সভ্যতার আর এক ধাপে এগিয়ে গেলো।

স্পেনের আলতামিরা গুহাচিত্রে শিকারীর হাতে তীর ধনুক দেখা যায়। মিশরের প্রাচীন অস্ত্রের তালিকায় ছিল এই তীর ধনুক। পিরামিডের দেওয়ালে বা পাত্রের ভাঙা অংশে তার প্রমান মেলে। গ্রীক পুরানে যে

সব দেব-দেবীদের কথা আছে, তাদের অনেকেই তীরধনুক ব্যাবহার করেন- যেমন,বন্যপ্রানী ও শিকারের দেবী আর্টেমিস।

আর্টেমিস -পিঠে রয়েছে তীরের বোঝা

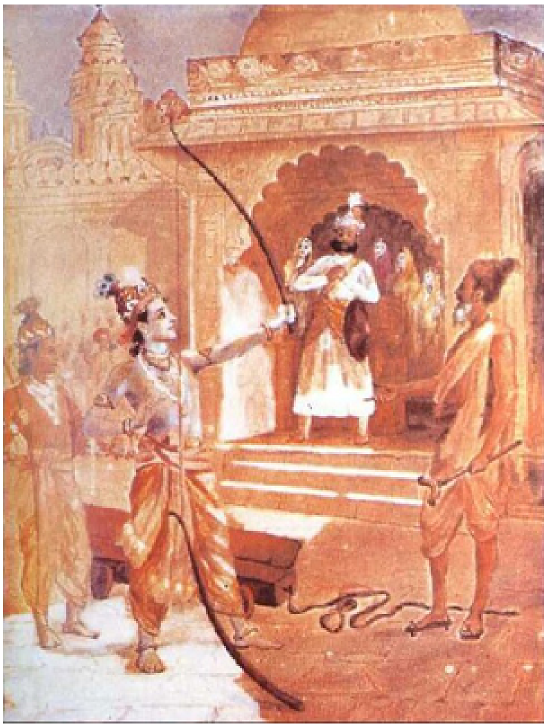

রাজা রবি বর্মার আঁকা রামের হরধনু ভঙ্গ

তীরধনুক হাতে বীর অর্জুনের এই মূর্তিটি আছে বালিদ্বীপে

পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা এখোনো তীর ধনুকের ব্যবহার করেন। কোনো কোনো আদিম উপজাতি বা জনজাতিরা পূজা করেন এই অস্ত্রের। বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয় তীর ধনুককে। তুমি কি সাঁওতাল বিদ্রোহে সিদহু-কানহুর কথা জানো? বিরসা মুন্ডারবা কিম্বা তিতুমীরের কথা...তাঁর বাঁশের কেল্লার কথা? পরাধীন ভারতবর্ষে এঁরা সবাই ইংরেজদের সেই ভয়ঙ্কর কামান আর বন্দুকের সামনে লড়াই করেছিলেন তীর ধনুক নিয়ে। তাঁদের সেই বীরত্বের কথা দেশ প্রেমের কথা আজও আমরা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিদহু আর কানহু

বীরসা মুন্ডা- তীর ধনুক নিয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন

ধনুক ব্যবহার করতে দরকার ব্যবহারকারীর শক্তি ও দক্ষতা। ধনুকের ছিলায় তীর যোজনা যাকে আমরা গুণ পরানো বলি তার জন্য যিনি ব্যবহারকারী তাঁর নিজস্ব ধনুকের ব্যবহারেই পূর্ণ দক্ষতা প্রকাশ পায়। দুটো উদাহরণ দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের খবর পেয়ে কৌরবেরা যখন ধ্রুপদ রাজ্য আক্রমণ করলেন, সেখানে বৃহন্নলাবেশী অর্জুন সেই আক্রমণ ঠেকাতে তাঁর লুকোনো তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধে নামলেন। তাঁর ধনুকের টঙ্কার শুনে কৌরবেরা নিশ্চিত হলেন ছদ্মবেশের আড়ালে আর কেউ নন তিনি স্বয়ং অর্জুন। তীর ধনুক নিয়ে আরো একজন বীরের নাম তুমি নিশ্চই জানো তিনি হলেন রবীন হুড। দুঃখী মানুষের ত্রাতা রূপে আজও এই নামটি খবরের কাগজে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আরেক বিখ্যাত ধনুর্ধর - রবিনহুড

তীর ধনুক নিয়ে অনেক দিন লড়াই করে বেঁচে থাকা মানুষের কাছে বারুদ আবিষ্কারের পর এর প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে এলো। শুধু মাত্র রয়ে গেলো এই অস্ত্রটি নিয়ে প্রতিযোগিতা। তীর ধনুক নিয়ে খেলা। ইতিহাস সংরক্ষণ ও কথনে অন্য সব দেশের চেয়ে একটু বেশি পটু ও মনোযোগী ইংরেজরা এই ইতিহাস ধরে রেখেছেন ১৭৮০ সাল থেকে। লিস্টারশায়ারে স্যার অ্যাশটন লিভার তাঁর কিছু বন্ধু বান্ধব

নিয়ে তীর ধনুক খেলার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রয়্যাল টক্সোফিলিট সোসাইটি [Royal Toxophilite Society]। লন্ডনের রিজেন্ট পার্কের অফিস থেকে আজও এঁরা বিশ্ব তিরন্দাজী খেলার নিয়ম কানুন ঠিক করেন।

সুদূর অতীতের অস্ত্র আজ অন্যতম একটি প্রতিযগিতা মূলক খেলা। তার গাল ভরা নাম তীরন্দাজী, ইংরাজিতে আর্চারি [Archery]। এই খেলার নিয়ম কানুন মেনে ওলিম্পিকে যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারেন তিনিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। এবার বলো তো দেখি, আমাদের বাংলার এক মেয়ের নাম, যিনি কিনা আবার ওলিম্পিকে ভাগ নেওয়া প্রথম ভারতীয় মহিলা তীরন্দাজ? - ঠিক ধরেছো - তিনি হলেন বরানগরের মেয়ে দোলা ব্যানার্জি।

দোলা ব্যানার্জি

দোলা হলেন ভারতের প্রথম মহিলা তীরন্দাজ, যিনি অর্জুন পুরষ্কার পেয়েছেন। অর্জুন পুরষ্কার কি জানোতো? খেলাধূলায় ভারতের সর্বোচ্চ পুরষ্কার হল অর্জুন পুরষ্কার।

তাহলেই ভাবো একবার - সেই গ্রীক পুরাণের আর্টেমিস থেকে মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা হয়ে আজকের ভারতের দোলা - কত কত যুগ পেরিয়েও তীর -ধনুক কেমন করে আজও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। অস্ত্রের চেহারা বদলেছে অনেক, ব্যাবহারও বদলেছে, কিন্তু তীর -ধনুকের সাথে মানুষের সম্পর্ক আজও অটুট।

প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
বালী, হাওড়া

ছবি
আইলাভইন্ডিয়া
উইকিমিডিয়া

রাজ্যসভা
ডব্লিউবিগভ

আঁকিবুকি

সম্পূর্ণা ঘোষ, ৮ বছর, লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র

মালিকা দত্ত, ৮ বছর, সন্তোষপুর, কলকাতা

অনুভব শেঠ, ৭ বছর, বেইজিং, চিন